আমাদের দেশে দুই শ্রেণীর লেখক বিদ্যমান। কোন শ্রেণীর লেখক বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত না রহিয়া, সমাজটাকে নানারূপ সংস্কার দ্বারা একটা নূতন ছাঁচে গঠিত করিয়া, তাহার তলে সকলকে বিশ্রাম লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করিতেছে। ইঁহাদের সমাজের ভিত্তি ভবিষ্যতের কাল্পনিক ছায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ইঁহারা প্রাচীন ধর্ম্মরীতি ও নীতির অনুসরণ দেশের কল্যাণজনক বলিয়া বিবেচনা করেন না, অথবা উহা পালন আধুনিক কালের লোকের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। কোন শ্রেণীর লেখক বর্ত্তমান সমাজকে নব আদর্শে গঠিত করিতে না চাহিয়া, প্রাচীনের ভিত্তির উপর উহা স্থাপিত করিতে চাহেন। প্রচীন কালের স্মৃতি ইঁহাদের নিকট এত প্রিয় যে, ইহারা প্রাচীন ছাড়িয়া দিয়া বর্ত্তমান লইয়া সুখী হইতে চাহেন না, অথবা সুখী হইতে পারেন না। গিরিজাপ্রসন্ন এই শ্রেণীর লেখক। উল্লিখিত প্রবন্ধটা পড়িয়া আমরা কি গিরিজা প্রসন্নের একটা ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারি না? প্রাচীন ভারত যেজন্য সর্ব্বত্র গৌরবান্বিত, আমরা যদি তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, প্রাচীন ভারতবাসীর ধর্ম্মজ্ঞান এবং শক্তি যদি আমাদের নিকট অসামান্য বলিয়া অনুভূত হয়, প্রাচীন ঋষিদের প্রদর্শিত পথ যদি নিষ্কণ্টক, তাঁহাদের যুক্তি যদি অভ্রান্ত, ও তাঁহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি যদি হিমাদ্রির ন্যায় অটল ও দৃঢ় হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কল্পিত পথ পরিত্যাগ করিয়া আদর্শ লাভের জন্য কেন বিভিন্ন পথগামী হইব? তাহাদের স্থিরীকৃত রীতি, নীতি, আচার যদি ন্যায্য ভাবে পরীক্ষিত হয়, তাহা হইলে কি আমরা দেখিতে পাইনা যে, তাঁহাদের প্রদর্শিত শাসন নিয়মাদিই আদর্শ লাভের অনুকূল? তাঁহাদের নির্দ্ধারিত পথই সোজা, বিপদ-শূন্য ও লক্ষ্য বস্তুর নির্দ্দেশক। বর্ত্তমান সংস্কারক দলের ও প্রাচীন ঋষিদের মত বিশেষ রূপ বিচার করিয়া গিরিজাপ্রসন্ন প্রাচীন ঋষিদের মতেই বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাই বর্ত্তমান সমাজকে ঋষি-প্রদর্শিত মতের বিরুদ্ধে গমনোন্মুখ দেখিয়া, গিরিজাপ্রসন্ন, নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, উহাকে প্রাচীনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি গুলিতে দেশভক্তি যেরূপ দেদীপ্যমান, তদ্রূপ বিচার শক্তির পরিচয়ও বিলক্ষণ। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু ও মনস্বী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় যেপথ অনুসরণের জন্য হিন্দুদের নিকট গৌরবের ও ভক্তির পাত্র, গিরিজাপ্রসন্নও সেই পথ অনুসরণ করিয়া শ্রদ্ধেয় ও কীর্ত্তিমান হইয়াছেন। সংসারে ধর্ম্মের কিরূপ স্ফূর্ত্তি হয়, তাহার সিদ্ধান্ত ও রমণীগণেকে তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান, উভয়ই বহু জ্ঞান ও বিচার সাপেক্ষ। গিরিজাপ্রসন্ন গৃহলক্ষ্মীর প্রতি পৃষ্ঠায় সেই জ্ঞান ও বিচার শক্তির পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। তাই গৃহলক্ষ্মী গৃহিণীগণের নিকট উজ্জ্বল ভাবে শোভা পাইতেছে। আজকালকার দিনে এরূপ একটা দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিখুঁৎভাবে সম্পন্ন করা কম সৌভাগ্যের কথা নহে।

নবীন গ্রন্থকার প্রথম সংস্করণে গৃহলক্ষ্মীকে নির্দ্দোষ করিয়া প্রকাশিত করিতে না পারায়, অনেক সংবাদ পত্র, সমালোচনা করিতে গিয়া, উহার দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সব দোষের পরিমাণ খুব

অল্প। গ্রন্থকার যে সব স্থল প্রকৃত দোষযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সে সব স্থল সংবাদ পত্রের অভিমতানুযায়ী গৃহলক্ষ্মীর ২য় সংস্করণে পরিবর্ত্তিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। তবে সংস্কারপ্রার্থী নব্য সমালোচকের কথানুযায়ী এমন কোন স্থল পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করেন নাই, যাহা শিক্ষা দিলে, হিন্দু-সমাজ কি হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ পায়। আমরা দেখিতে পাই, সাধারণীর সম্পাদক বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের অনেক মন্তব্য গৃহলক্ষ্মীর ২য় সংস্করণে গৃহীত হইয়াছে। অগ্নিতে দাহন করাই যেমন কাঞ্চন-বিশুদ্ধিতার অমোঘ ঔষধ, সেইরূপ, বিচারশক্তি প্রবল সমালোচকের সমালোচনাই গ্রন্থ-দোষ ক্ষালণের প্রধান উপায়। আমাদের দেশে যিনি বঙ্গসাহিত্য-সম্রাট বলিয়া প্রসিদ্ধ, যাঁহার শিল্পচাতুর্য্যে ও রচনা-কৌশলে বঙ্গভাষা পূর্ণকলেবরা, সেই মহাপুরুষও তাঁহার সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ প্রকাশ করার সময়, আশানুরূপ যশঃ লাভ করিতে পারেন নাই।

কবিতা রচনা।

গিরিজাপ্রসন্নের কবিতা রচনারও ক্ষমতা ছিল। আমরা তাঁহার নোটবুকে কয়েকটী সুন্দর কবিতা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে জানিয়াছি, উহা তাঁহারই রচিত, তিনি ঐ কবিতাগুলি কোন পুস্তকে বা মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন কিনা, তদ্বিষয়ে এখন পর্য্যন্ত কিছু পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। আমাদের দেশীয় গদ্য-রচনাকুশল লেখকগণ প্রায়ই কবিতা লিখিতে অভ্যস্ত নহেন। গিরিজাপ্রসন্নের এই কবিতা দুইটী অন্ততঃ গদ্য-লেখকদিগের কথঞ্চিৎ চিত্তরঞ্জনে সমর্থ হইবে, এই আশায় উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"সতীর্থ যুবকের প্রতি ভালবাসায় অধীরচিত্ত কোন এক যুবকের উক্তি"—

Not showers to larks so pleasing,
Nor sunshine to the bee,
Nor sleep to toil so easing,
As those dear smiles to me"
Pope

(১)

যাহাকে দেখিতে সদা চাহে মন,
বুঝি না সে কেন লুকায় বদন;
নহেতো রমণী, ভাবিবে কি জানি,
দরশনে কত আপদ আছে।
তবে কি বলিয়ে, প্রবোধিব মনে,
কেন প্রিয়তম থাকে সঙ্গোপনে,
কঠোর হৃদয় ভাবি না তাহায়,
এ হৃদয় ব্যথা পাইবে পাছে॥

(২)

চাহিনা তাহার ভালবাসা আমি,
কেন যে চাহিনা জানে অন্তর্য্যামী,
কেবল দেখিব, কেবল শুনিব।
সে ফুল্ল আনন মধুর বাণী।
ভালবাসি এই চাহি প্রতিদান,
আনিয়ে নয়নে সমস্ত পরাণ,
ভুলিয়ে আমায়, দেখিব তাহায়,
হবেনা বিমুখ সখা তাহা জানি॥

(৩)

কি ক্ষতি তাহার হইবে দেখিলে,
আর কিছু নয় কথাটী শুনিলে,
তবে কেন হায়, দেখিলে আমায়
অধোমুখে প্রিয় স্তব্ধ হয়।
বলিব কি তাকে বিরলে ডাকিয়ে,
প্রাণাধিক মোর দেখগো চাহিয়ে,
হৃদয় ভিতর ও মূর্ত্তি সুন্দর,
দরপণে যথা ফলিত রয়॥

(৪)

থাক নাহি চায় শুনাতে তাহায়,
দেখাতে এ পোড়া তন্ময় হৃদয়,
লুকিয়ে লুকিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে,
সুখী আছে মন বেশী না চায়,

যতদিন দেহে রহিবে পরাণ,
যতদিন চিতে সঞ্চারিবে জ্ঞান,
সুখ শান্তি তার হর্ষ অনিবার
প্রার্থিব জগৎ নিয়ন্তা পায়॥

"পূর্ব কথিত যুবকের প্রতি পূর্ব্বোক্ত যুবকের"—

Irregular sonnet not (obeying its rules)

"A thing of beauty is a joy for ever"
Keats

ত্যজি বৃথা লজ্জা, খুলি ক্ষীণশক্তি বলে
প্রেমের—শক্তিমান মহাভাবের জগতে
মনদ্বার -অবরুদ্ধ চির জ্ঞানার্গলে
সংসারের, এসেছি ভেটিতে তোমা সথে।
কর ঘৃণা, যদি ইচ্ছা হয়, প্রণয়ী যে
অভিমান তার না সম্ভবে। মুগ্ধ আমি
দেখি তব বদনমণ্ডলে সরলতা,
(শরতের জলে যেন পবিত্র চন্দ্রিকা)
পবিত্রতা (দয়া মাখা অঙ্গে স্বরগের)।
হাস্থক জগৎ নাহি খেদ—ঘৃণাযুক্ত
হাসি—রূপে মুগ্ধ দেখি আমা, বিস্ময়ে
সেই সত্য, কহে যেই, চিরদিন ভবে
পবিত্রতা—প্রতিমূর্ত্তি চিত্তমুগ্ধকর।

কবিতার ভাবই যদি প্রাণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, পূর্ব-কথিত যুবকের উক্তি বেশ সজাব। প্রণয়াকাঙ্ক্ষী যুবক, ভালবাসা লাভের জন্ত অধীর, কিন্তু মুখ ফুটিয়া ভালবাসার কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত। কি জানি পাছে যদি তাহাকে নিরাশ হইতে হয়! এক শ্রেণীর প্রণয়ী প্রণয় লাভের জন্য সচেষ্টিত হইয়া, বাহ্যিক ও আন্তরিক ব্যবহার দ্বারা প্রণয় পাত্রের প্রতি প্রণয় লক্ষণ সূচনা করিয়া থাকেন; এইরূপ ব্যবহার দ্বারা শেষে উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। অপর শ্রেণীর প্রণয়ী হৃদয়ের মধ্যে প্রণয়ারাধ্যের মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাহার পরিচিন্তনে নিমগ্ন রহেন। প্রণয়-প্রার্থী জানিতে দিতে চাহেন না—প্রণয়-পাত্রের প্রতি তাহার কত অনুরাগ। এই শ্রেণীর প্রণয়ী ফল্গুনদীর স্রোতের ন্যায় প্রণয়-প্রবাহ হৃদয়ের অভ্যন্তরে ধারণ করিয়াই পরিতৃপ্ত রহেন। ইঁহারা, দুইটী কারণে, এইরূপ নীরব প্রণয়ের প্রশ্রয় দিয়া থাকেন, প্রথম কারণ—ইঁহারা আরাধ্য জনের মধ্যে এত কামনাচরিতার্থোপযোগী গুণ দৃষ্টি করেন যে, উঁহাদের তুলনায় স্বকীয় শক্তি অসার বলিয়া অনুভূত হয়। তাই স্বকার শক্তিহীনতার জন্য প্রণয় লাভের অযোগ্য মনে করতঃ প্রণয় জ্ঞাপন করিতে সাহসী হয়েন না, নীরবে ভালবাসিতে শিক্ষা করিয়া থাকেন। ২য় কারণঃ—প্রণয় পাত্রকে ভালবাসার সূচনাতেই ভালবাসা জানাইতে বাধা প্রাপ্ত হইয়া গোপনে ভালবাসিতে অভ্যস্ত হয়েন। সেই ভালবাসা শেষে মার্জ্জিত হইয়া পরিপুষ্ট হইলে নিষ্কাম ভাব ধারণ করে। তখন ভালবাসার পাত্রকে ভালবাসা জ্ঞাপন ও অজ্ঞাপন তুল্য সুখপ্রদ মনে হয়। কারণ তাহারা নীরবে ভালবাসিয়াই তখন প্রণয়-কল্পিত সুখ অনুভব করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকেন। প্রণয়াকাঙ্ক্ষী যুবকের উক্তি ও প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া উহাকে নিষ্কাম শ্রেণীর প্রণয়ী বলা যাইতে পারে। এই কবিতাটীর রচনাতে শব্দ বিন্যাসের মাধুর্য্য না থাকিলেও, গ্রন্থকার প্রণয়াভিলাষী যুবকের হৃদয়খানি সরল রচনা দ্বারা বেশ স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয় কবিতাটীতেও বেশ ভাবের উচ্ছ্বাস রহিয়াছে। এই কবিতা দুইটী পড়িয়া কি ধারণা হয় না যে, গিরিজাপ্রসন্ন যদি পদ্য লেখার জন্য কলম ধারণ করিতেন, তাহা হইলে সে রচনাতেও বেশ কৃতীত্ব লাভ করিতে পারিতেন। আমরা স্থানান্তরে তাঁহার আরও দুই একটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী।

কর্ণেল অলকট।

[মহামতি কর্ণেল অলকট মহোদয়ের ইং ১৮৮৭ সালে নোয়াখালি নগরে আগমন উপলক্ষে কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেনের রচিত আবাহন। ১]

১

সুনীল আকাশে শ্বেত মেঘ মত,
নীল পারাবারে মাতা শ্বেতাঙ্গিনী,
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, যৌবন-গর্ব্বিনী,
মার্কিণের * অঙ্কে বসি ধ্যান রত,
হে শ্বেতঋষি! তুমি দেখিলে কি হায়!
আমাদের মাতা পতিতা ভারত,
পাশ্চাত্য সভ্যতা দর্শন ধুঁয়ার,
যাইছে ছুটিয়া নিপাতের পথ!

২

শান্তি-সিন্ধু † তীরে শ্বেতাঙ্গ ঈশান,
বিষাণ ঝঙ্কারে কহিলে সম্ভাষি,
"হায় মা! ফিরিয়া দেখ রাশি রাশি,
"তারানন তব অতীত বিমান।
"যোগীন্দ্র, মহাত্মা, অমরেন্দ্রগণ,
"হিমাদ্রি শেখরে ওই অগণন।
"দাঁড়াইয়া ওই নর নারায়ণ,
'পাঞ্চজন্য রবে প্লাবিয়া গগন,
"কহিছে,—'ত্যজিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম, নর,
"লও একমাত্র আমার শরণ।'
"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

৩

ফিরিলা জননী, দেখিলা চাহিয়া,
নক্ষত্র খচিত অতীত তাহার!
তব কণ্ঠ তাহে উঠিছে ভাসিয়া,
ডুবায়ে পাশ্চাত্য ঝিল্লির ঝঙ্কার।
মৃতা ভারতের দিলে তুমি প্রাণ,
লও পাদ্য-অর্ঘ, ঋষি আয়ুষ্মান্।

(সংগ্রহকার)

শ্রীআশুতোষ দেব।

গীতার ঐতিহাসিকতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(চ) কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়।

ভারতবর্ষের কোন পুরাতন ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নির্দ্ধারণ করা অতীব দুরূহ। কারন আমাদের ক্রমিক এবং ধারাবাহিক ইতিহাস বলিয়া কিছুই নাই; সুতরাং কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, হয় অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়, না হয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহা নিরূপিত করিয়াছেন, তাহা মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য

(১) তমলুকের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট স্বর্গীয় কবিবরের স্বহস্ত-লিখিত উক্ত কবিতাটী এখনও বর্ত্তমান আছে। ইং ১৮৮৭ সালে যখন কর্ণেল অলকট নোয়াখালিতে পদার্পণ করেন, তখন যোগেন বাবু ও স্বর্গীয় কবিবর নোয়াখালিতে ছিলেন।— সংগ্রহকার।

* America.

† Pacific Ocean.

পণ্ডিতগণ অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যে ভ্রান্ত হইয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, আধুনিক প্রাচ্য পণ্ডিতগণ অনেক গবেষণা করিয়া আভ্যন্তরিক জ্যোতিষিক প্রমাণ বহুল পরিমাণে আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নির্দ্ধারণ করা অনেকটা সুবিধাজনক হইয়াছে। আমরা প্রথমে সেই সকল জ্যোতিষিক প্রমাণ পাঠকবর্গের সম্মুখে স্থাপিত করিব। সেই সকল প্রমাণ হইতে ঐতিহাসিক ঘটনার সময় অনেক পরিমাণে নির্দ্ধারিত করিতে পারা যাইবে। পরে শ্রীকৃষ্ণের সময় সম্বন্ধে আমরা বহু গবেষণা করিয়া যাহা পাইয়াছি, তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করিব। আজ চারি পাঁচ হাজার বৎসর হইল, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। এতদিন পরে আমরা এমন কোন নির্বিবাদী এবং নিশ্চিত প্রমাণ আবিষ্কার করিতে পারি নাই, যাহা হইতে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, মহাভারত এবং তদন্তর্গত গীতা অমুক বৎসরে রচিত হইয়াছে। তবে আমরা ইহা বলিতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এতদ্ সম্বন্ধে যে সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা ঠিক নহে। আমরা নিম্নে তাহার আলোচনা করিলাম।

এদেশের চলিত বিশ্বাস এই যে, কৃষ্ণ দ্বৈপায়নব্যাস বেদ চতুষ্টয় এবং ভারত-সংহিতা সংকলন করিয়াছিলেন। তিনি মহাভারত যুদ্ধের সমকালবর্ত্তী। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ পাণ্ডব, তাঁহারই পৌত্র। অতএব বেদাদি সঙ্কলনের কাল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক। আমরা যদি কোন প্রকারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারি, তাহা হইলে ভারত সংহিতা ও তদন্তর্গত গীতা প্রণয়নের সময় এবং শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাল নির্দ্ধারিত করিতে পারিব। অথবা আমরা যদি শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাল নির্দ্ধারিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় এবং মহাভারত অথবা গীতা প্রণয়নের সময় নির্দ্ধারিত করিতে পারিব।

বেদের সঙ্কলনের কাল যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, বিষ্ণুপুরাণ হইতে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া এই এক সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছেন। তাঁহাদের সকলেরই এই মত যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও বেদের সঙ্কলন সমসাময়িক ঘটনা।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে Colebrook, Wilson এবং Elphinstone বলেন যে, খ্রীঃ পূঃ ১৪ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। Wilford বলেন, খ্রীঃ পূঃ ১৩৭০ অব্দে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। Sir William Jones এবং Davis বলেন যে, খ্রীঃ পূঃ ১১৮১ অব্দে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। Pratt বলেন যে, খ্রীঃ পূঃ ১২শ শতাব্দীতে মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল। Bentley সাহেবের মত এই প্রকার যে, খ্রীঃ পূঃ ৫৭৫ অব্দে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু আমাদের দেশীয় পুরাতত্ত্ববিদগণের ধারণা অন্য প্রকার। V.G.Aiyer তাঁহার Chronology of Ancient India নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ১১৭৬ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় তাঁহার "আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দে মহাভারত

রচিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল নির্ণয় সঠিক কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

বেদ সঙ্কলনের সময় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক বৈদিক সাহিত্য হইতে অশেষ গবেষণা পূর্ব্বক যে সকল জ্যোতিষিক যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তিলক শতপথ-ব্রাহ্মণে নিম্নলিখিত বিষয়টীতে আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছেন। যথা,—

"এতাঃ (কৃত্তিকাঃ) প্রাচ্যৈ দিশোনচ্যবন্তে। সর্ব্বানি হ বা অন্যানি নক্ষত্রানি প্রাচ্যৈ দিশশ্চ্যবন্তে।" (২।১।২,৩)

এই বচন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যখন শতপথব্রাহ্মণ রচিত হয়, তখন বিষুবন্ (First Point of Aries) কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছিল। কিন্তু এখন বিষুবন্ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে রহিয়াছে। অর্থাৎ তখন হইতে এখন পর্য্যন্ত বিষুবন্ প্রায় ৬০ ডিগ্রি কবিয়া আসিয়াছে। ৬০° ডিগ্রিতে = ৬০ × ৬০ × ৬০ = ২১৬০০০ বিকলা। জ্যোতিষীরা স্থির করিয়াছেন যে, বিষুবন্ প্রতি বৎসরে প্রায় ৫০ বিকলা সরিয়া যায়। অতএব মোটামুটী ধরিতে গেলে ইতিমধ্যে ৪৪০০ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, শতপথব্রাহ্মণ রচনার সময় খ্রীঃ পূঃ প্রায় ২৫০০ বৎসর, অর্থাৎ এখন হইতে ৪৪০০ বৎসর। শতপথব্রাহ্মণে পরীক্ষিৎ ও জন্মেজয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং উহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অনেক পরে রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে বেদের সঙ্কলন কাল যে প্রায় ৫০০০ বৎসরের সমীপবর্ত্তী, তাহা মনে করা অসঙ্গত নহে। যদি বেদের সঙ্কলন কাল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক, তাহা হইলে পাশ্চাত্য মত অনুসরণ করিয়া আমরা কেমন করিয়া বলিতে পারি যে, খ্রীঃ পূঃ ১৩শ শতাব্দীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল? ধবওয়ায়ের অন্তর্গত ইবল্লি নামক স্থানে একটী শিবমন্দিরে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময় স্পষ্টাক্ষরে খোদিত আছে। উহাতে লিখিত হইয়াছে যে "৫০৬ শকাব্দে অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৩৭৩০ বৎসর পরে" ঐ মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন ১৮৩০ শকাব্দা, সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ৫০৫৪ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল।

ইহা ভিন্ন অন্যান্য জ্যোতিষিক প্রমাণ আছে। তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত মত দৃঢতর হইয়া থাকে। যুধিষ্ঠিরের সময় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে ও বিষ্ণুপুরাণে* এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিল। যথা :—

"প্রায়ান্তন্তি যদাচৈতে পূর্ব্বাষাঢাং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলিবৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥"
(বিষ্ণু—৪—২৪—৩৭)

"যদা মঘাভ্যো যাস্যন্তি পূর্ব্বাষাঢাং মহর্ষয়ঃ।
তদানন্দাৎ প্রভৃত্যেষ কলির্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি॥"
(ভাগবত—১২—২—৩২)

বায়ুপুরাণেও (৩৭ অঃ—১১৩ হইতে ১১৭ শ্লোক) এইরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে 'বৃহৎ-সংহিতা'—নামক জ্যোতিষ গ্রন্থপ্রণেতা বৃদ্ধ গর্গ এই কথা উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন যে, "আসন্ মঘাসু শাসতি পৃথ্বীং যুধিষ্ঠিরে নৃপতৌ।" কিন্তু আমরা এক্ষণে সপ্তর্ষি-মণ্ডলকে কৃত্তিকা নক্ষত্রে স্থিত দেখিতে পাই।

* কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে আবার অন্য প্রকারও লক্ষিত হয় যে, সপ্তর্ষি পরীক্ষিতের সময় মঘানক্ষত্রে ছিল এবং তখন কলির বয়স ১২০০ বৎসর হইয়াছিল (৪।২৪।৩৬)। কিন্তু জ্যোতিষ গ্রন্থে আমরা অন্য প্রকার দেখিয়া থাকি। সুতরাং কলির বয়স সম্বন্ধে এই অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পুরাণে আরও অনেক জ্যোতিষবচন আছে, তাহারা পরস্পর বিরোধী বলিয়া আলোচিত হইল না।

এই মণ্ডলের নাক্ষত্রিক ভোগকাল শত বৎসর, যথা—"একৈকস্মিন্ ঋক্ষে শতং শতং তে চরন্তি বর্ষাণাং।" যে সপ্তর্ষি পূর্ব্বে মঘা-নক্ষত্রে ছিল, সেই সপ্তর্ষিকে আমরা এক্ষণে কৃত্তিকানক্ষত্রে দেখিতে পাই। সুতরাং ইহার কৃত্তিকাবাসের পূর্ব্বে ভরণীবাস, ভরণীর পূর্ব্বে অশ্বিনী, তৎপূর্ব্বে রেবতী, এইরূপ ব্যুৎক্রম নিয়মে গণনা করিয়া Cunningham সাহেব বলেন যে, নিম্নলিখিত বর্ষগুলিতে মঘা সপ্তর্ষি-মণ্ডলে ছিল এবং থাকিবে। যথা খ্রীঃ পূঃ ৫৮৭৭, ৩১৭৭, ৪৭৭ এবং খ্রীঃ অব্দ ২২২৫,—অর্থাৎ ২৭০০ বৎসর অন্তর ইহাদের পরিবর্ত্তন ঘটে। অতএব যদি সম্ভব অনুসারে মঘাবাসের সংখ্যা গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ৩১৭৭+২৭০০=৫৮৭৭ বৎসর হইয়া থাকে। সুতরাং ৫০৮৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

বিষ্ণুপুরাণে অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে,—

"প্রথমে কৃত্তিকা ভাগে যদা ভাস্বাংস্তথা শশী।
বিশাখানাং চতুর্থেহংশে মুনে তিষ্ঠত্যসংশয়ম্ ॥৭১
বিশাখানাং যদা সূর্য্যশ্চরত্যংশং তৃতীয়কম্।
তদাচন্দ্রং বিজানীয়াৎ কৃত্তিকা শিরসিস্থিতম্ ॥৭২
তদা বিষুবাখ্যো বৈ কালঃ পুণ্যোঽভিধীয়তে ॥"৭৩
(২য় অংশ—৮ অধ্যায়)

অর্থাৎ, হে মুনে! যখন সূর্য্য কৃত্তিকার প্রথম ভাগে, অর্থাৎ মেষান্তে এবং চন্দ্র বিশাখার চতুর্থ ভাগে, অর্থাৎ বৃশ্চিকারম্ভে অবস্থিত হয়, কিম্বা সূর্য্য যখন বিশাখার তৃতীয় অংশে অর্থাৎ তুলার অন্তভাগ ভোগ করেন এবং চন্দ্র কৃত্তিকার প্রথম পাদে অর্থাৎ মেষান্তভাগে অবস্থান করেন, তখনই পবিত্র বিষুবনামা কাল, অর্থাৎ ক্রান্তিপাতের সময় বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

তৈত্তিরিয় সংহিতা, তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, সূর্য্য যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে অবস্থিত ছিল, তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত। তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণে (১ ১-২-১) কৃত্তিকাকে নক্ষত্রগণের মুখস্বরূপ বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে (১-১৯-৭) এবং যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে কৃত্তিকানক্ষত্রকে আদি নক্ষত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত বিষ্ণুপুরাণের মতে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত, এইরূপ উক্ত হইয়াছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইয়া বলিতেছেন যে,—

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগ শেষঃ পক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি ॥"
(১৬৭—২৭)

এই শ্লোক হইতেও অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইবার কিছুদিন পরে অর্থাৎ মাঘমাসের অমাবস্যা হইতে পঞ্চম দিন পরে হৈমন্তিক ক্রান্তিপাত হইয়াছিল।

এই সকল তত্ত্ব হইতে হিন্দুজ্যোতির্বিদেরা স্থির করিয়াছেন যে, বেদ সঙ্কলের সময়ে, যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ে, অথবা শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময়ে কৃত্তিকা নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইত, অর্থাৎ সেই সময়ে বিষুবন্ কৃত্তিকা নক্ষত্রে ছিল। পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, সে আজ ৫০৮৬ বৎসরের কথা।

(ছ) শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কাল।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ সকল হইতে আমরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কতক পরিমাণে নির্দ্ধারিত করিতে পারিয়াছি। এক্ষণে দেখা যাউক যে, শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় সম্বন্ধে অন্য কোন প্রমাণ আছে কি না, এবং উহা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়ের সহিত মিলে কি না। বিভিন্ন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া যদি এই দুইটী সময়ের মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা

হইলে উহাদের মধ্যে যে কোনটী সময় যে ব্যাসদেবের আবির্ভাবের কাল, সুতরাং গীতা প্রণয়নেরও কাল হইবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় লইয়া পুরাণাদি শাস্ত্রে মতদ্বৈধ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।" শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—

"যস্মিনকৃষ্ণো দিবং যাতস্তস্মিন্নেব তদাহনি।
প্রতিপন্নং কলিযুগমিতি প্রাহুঃ পুরাবিদঃ॥"
(১২।২।১:)

অর্থাৎ, যে দিন শ্রীকৃষ্ণ দিব্যলোকে গমন করিলেন, সেই দিনেই কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যত্র আমরা দেখিতে পাই যে,—

"অথ ভাদ্রপদে মাসি কৃষ্ণাষ্টম্যাং কলৌযুগে।
অষ্টাবিংশাতিমে জাতঃ কৃষ্ণাসৌ দেবকীসুতঃ॥"

এই প্রমাণ হইতে আমরা অবগত হই যে, শ্রীকৃষ্ণ কলির প্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

অন্যস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে,—

"ভারতং দ্বাপরান্তেহভূৎ বার্ত্তয়েতি বিমোহিতাঃ।"

ইহার উপর নির্ভর করিয়া রাজতরঙ্গিণীকার প্রাচীন কহ্লন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণ জন্ম দ্বাপরের শেষে নহে, কলির প্রথমে। তাঁহার মতে 'দ্বাপরান্তে' মানে দ্বাপর যুগ অন্ত হইলে। কুরুপাণ্ডবগণের আবিভাবের সময় সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে,—

"গতেষুষট্‌সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণাম্ অভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ॥"

অর্থাৎ কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণীকার আরও বলেন যে, কাশ্মীররাজ গোনর্দ্দ যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক। তিনি কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর অতীত হইলে, আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং যুধিষ্ঠিরও ঐ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

আবুল ফাজেল আইন-ই-আকবরীতে লিখিয়াছেন যে, আকবরের যখন ৪০ বৎসর রাজত্ব হইয়াছিল, (অর্থাৎ ১৫৯৫ খ্রীঃ অব্দে) তখন যুধিষ্ঠিরের ৪৬৯৬ সংখ্যক বর্ষ অতীত হইয়াছিল। সুতরাং ৪৬৯৬—১৫৯৫=৩১০১ খ্রীঃ পূঃ অব্দে যুধিষ্ঠির রাজা হইয়াছিলেন; এবং তিনি আরও বলেন যে, তখনই কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা আবুল ফাজেলের কথা সবিশেষ বিশ্বাসযোগ্য মনে করি না, কারণ তিনি পূর্ব্বে এক কথা বলিয়াছেন এবং পরে আর এক কথা বলিয়াছেন। যথা,—মহাভারত দ্বাপর যুগের শেষে হইয়াছিল, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দ্বাপর যুগের ১৫০ বৎসর থাকিতে হইয়াছিল, ইত্যাদি।

আর্য্যভট্টের মতে কলিযুগের ৬৬২ বৎসর অতীত হইলে যুধিষ্ঠির রাজা হন। বরাহমিহিরের মতে কলিযুগের ৬৫০ অতীত হইলে মহাভারতের যুদ্ধ হইয়াছিল। বরাহমিহির বৃদ্ধ গর্গের মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, শকাব্দ আরম্ভ হইবার ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল বর্ত্তমান ছিল। এখন ১৮৩০ শকাব্দ, সুতরাং ১৮৩০+২৫২৬= ৪৩৫৬ বৎসর পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির বর্ত্তমান ছিলেন।

কিন্তু এখন জিজ্ঞাস্য যে কলিযুগ কবে আরম্ভ হইয়াছে? সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে খ্রীঃ পূঃ ৩১০২ অব্দে, বৃহস্পতিবার, মধ্যরাত্রে, ১৭।১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। আবার কাহার কাহার মতে পরদিন ১৮ই ফেব্রুয়ারি সূর্য্যোদয়ের সময় কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্জিকাতে আমরা দেখিতে পাই যে, "মাঘীপূর্ণিমায়াং শুক্রবারে কলিযুগোৎপত্তিঃ।" পাশ্চাত্য মতে জুলিয়ন অব্দের ৫৮৮৪৬৬ সংখ্যক দিনে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। ইহা বিক্রম সংবতের ৩০৪৪ বৎসর

এবং শকাব্দের ৩১৭৯ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে।

বোম্বায়ের বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত G. E. Sutcliffe গণনা করিয়া লিখিয়াছেন—খ্রীঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। তখন পবিত্র বারাণসীক্ষেত্রে ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময়ে সূর্য্যে গ্রহণ লাগিয়াছিল এবং ছয়টী গ্রহের একত্র সংযোগ (conjunction) হইয়াছিল। ঐ ঘটনায় ঠিক ৫০০০বৎসর পরে,গত ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখে,সেই ছয়টী গ্রহেরই সেই প্রকার সংযোগ(conjunction) হইয়াছিল এবং সূর্য্যেগ্রহণ লাগিয়াছিল এবং বারাণসী ক্ষেত্রের উপরেই ঠিক সূর্য্যোদয়ের সময়ই ঐ গ্রহণ ত্যাগ হইয়াছিল। * কলির প্রারম্ভ নিরূপণ সম্বন্ধে Sutcliffe এর মতই আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

আর্য্যাভট্ট, বরাহমিহির এবং কহ্লণ পণ্ডিতের মতে যুধিষ্ঠির কলিযুগের ৬৫৩ হইতে ৬৬২ বৎসরের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আমরা কিন্তু এ মতে সম্পূর্ণ আস্থা প্রদান করিতে পারিলাম না। কারণ আমরা মহাভারতে পাইয়াছি যে,—

"অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্ত পঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডব সেনয়োঃ॥"

(আদি—২—১৩)

অর্থাৎ, কলিদ্বাপরের সন্ধিসময়ে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন যে,—

"কলিদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ কৃষ্ণদ্বৈপায়ণঃ সংবভূব।"

অর্থাৎ, কলি দ্বাপরের সন্ধিতে ব্যাসদেব উদ্ভূত হইয়াছিলেন।

এখন সন্ধি কথাটীর অর্থ কি, তাহা অবগত হইতে হইবে। দ্বাপর ও কলির সন্ধি অথবা কলির প্রারম্ভ বলিলে ঠিক যেদিন দ্বাপর শেষ হইয়াছে বা কলির আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বুঝায় না। সন্ধি অর্থে মিলন। পুরাতন যুগের শেষ কয়েক শতাব্দী নূতন যুগের সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান করে। এবং কলির প্রারম্ভ বলিলে, কলির প্রাদুর্ভাবের আরম্ভ বুঝিতে হইবে। সুতরাং

* Let me conclude with a hint, which will possibly mean more to Indians than to Englishmen I gather it from a paper written by an eminent astronomer in Bombay, Mr. G E Sutcliffe, in the year 1899 On February 21st, B C 3101,' the day of the commencement of the Kali Yuga, "there was a conjunction of six planets and an eclipse of the sun *commencing* exactly at sunrise at the holy city of Benares A cycle of Kali Yuga, (i e 5,000 years) ended on December 3rd, 1899, when there was a similar conjunction of the same six planets, and also an eclipse of the sun which *ended* exactly at sunrise at *the holy city of Benares The two events* are exactly parallel, therefore, the only difference being that at the beginning of the Kali Yuga the solar eclipse *began* at sunrise,whilst at the end of the Kali Yuga the solar eclipse *ended* at sunrise " What does this mean to the Hindu? It means that a new era has begun, in which the ancient glory of India is to be restored, in which her slumbering spirituality shall be born anew and India become once more the light of the world. Nay there are even whispers abroad that just as five thousand years ago this earth was trod by the feet of an Avatar, a divine Incarnation of God, so the ' advent of a new Avatar is approaching," to quote Mr, Sutcliffe's words, "in whom science will see a Newton and religion a Saviour, who will gather up the scattered threads of knowledge and weave them into a grand generalisation, and who will, moreover, collect the truths embodied in the various religions, and focus them into a luminous ray of spiritual light."Such are whispers in India today, and on many sides you will hear that the numbers of great souls are incarnating at the present time for the salvation of India The time is one of expectation, of waiting for some great event—Indicus in the *Indian Daily News*, September-1908.

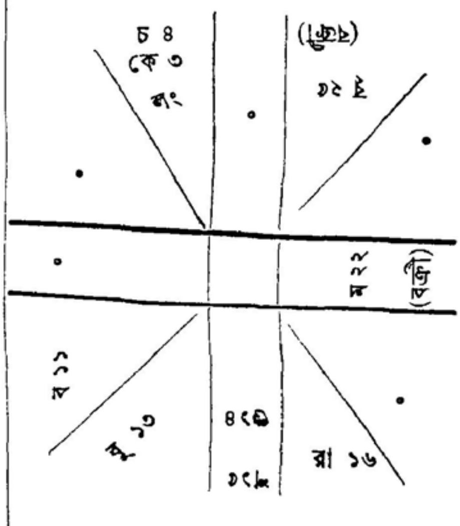
শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা যে দেখিতে পাই যে, যে দিন শ্রীকৃষ্ণ দিব্যলোকে গমন করিলেন, সেই দিনই কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইল—তাহার অর্থ আর কিছুই নহে, শ্রীকৃষ্ণের দেহ ত্যাগের পর কলিযুগের প্রাদুর্ভাব হইল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কহ্লন পণ্ডিতের মতে কলির ৬৫৩ বৎসর গতে যুধিষ্ঠির আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এখন আমরা দ্বাপর শেষ হইবার ৬৫৩ বৎসরকে যদি দ্বাপর ও কলির সন্ধিকাল ধরিতে পারি এবং আমরা যদি উক্ত প্রকারে গণনা করি, তাহা হইলে সকল মতের মিল দেখিতে পাই। শঙ্করাচার্য্যের মতে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের আবির্ভাব কাল কলি দ্বাপরের সন্ধিতে; মহাভারতের মতে কুরুক্ষেত্রের কাল কলি দ্বাপরের সন্ধিতে; এবং অন্যান্য পুরাণের মতে কৃষ্ণের জন্ম সময় কলির প্রথমে বা দ্বাপরান্তে,—এই সকল গুলি মতেরই মিল দেখিতে পাই, যদি আমরা 'সন্ধি' অর্থ উক্ত প্রকারে প্রয়োগ করিতে পারি। সুতরাং আমাদের মতে 'সন্ধির' অর্থ উক্ত প্রকারে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয়।

খমাণিক্য নামক জ্যোতির্গ্রন্থ হইতে শব্দকল্পদ্রুমে শ্রীকৃষ্ণের নিম্নলিখিত জন্মকোষ্ঠী উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—

"উচ্চস্থাঃ শশিভৌম চান্দ্রি শনয়োলগ্নং বৃষলাভগো,
জীবঃ সিংহতুলালিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনোরাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্রক্ষণে,
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরংব্রহ্মতৎ॥"

অর্থাৎ, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ ও শনি—এই চারি গ্রহ যখন উচ্চস্থ ছিল, বৃহস্পতি একাদশস্থ ছিল, সূর্য্য সিংহগত, শুক্র তুলাগত এবং রাহু বৃশ্চিক রাশিগত ছিল এবং যখন অষ্টমী তিথি, বুধবার, রোহিণী নক্ষত্র, বৃষলগ্ন এবং অর্দ্ধরাত্র হইয়াছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যখন বৃষে চন্দ্র সিংহে রবি, কন্যায় বুধ, তুলায় শনি ও শুক্র বৃশ্চিকে রাহু, মকরে মঙ্গল এবং মীনে বৃহস্পতি ছিল, তখন শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদি আমরা কোন প্রকারে উক্ত গ্রহ সন্নিবেশের সময় নির্দ্ধারণ করিতে পারি, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের কালও নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারিত হইবে এবং এই প্রমাণ সকল প্রমাণের অপেক্ষা বলবতী হইবে।

জলপঞ্জিকা-প্রণেতা মেদিনীপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত অযোধ্যা নাথ মণ্ডল মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, ৫১৪১ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন দ্বাপরের ১৩২।৭।১০ বাকী ছিল। নিম্নে শ্রীকৃষ্ণের কোষ্ঠীর গ্রহসন্নিবেশ ও গ্রহগণের স্ফুট প্রদত্ত হইল।



র	৪।১৯।৩৯।২৯	শু	৬।১।৫।০
চ	১।১৯।৩৫।৯	শ	৬।২০।০।৫২
ম	৯।১৫।৩।০ (বক্রী)	রা	৭।২।৮।২৩
বু	৫।১৫।৪২।০	কে	১।২।৩৮।২৩
বৃ	১১।১৫।৩৫।১৫ (বক্রী)	লং	১।২৩।২০।০
দ্বাপরের বাকী ছিল	...		১৩২।৭।১০
কলি ১৮৩০ শকাব্দ	...		৫০০৯।০।০
বৎসর গত			৫১৪১।৭।১০

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা সমূহ হইতে আমরা অবগত হইতেছি যে, ৫০০০ বৎসরের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ এই মর লোকে বিচরণ করিয়াছিলেন।

(ড) বৈদিক যুগ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের রচনা কাল খ্রীষ্টজন্মের দুই এক শতাব্দী পূর্ব্বে স্থির করিয়াছেন। তাঁহারা যে অপর্য্যাপ্ত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই মতে উপনীত হইয়াছেন, তাহা এখন অনেকেই বুঝিতে পারিয়াছেন। মহারাষ্ট্র পণ্ডিত তিলক বৈদিক যুগ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যে সকল অকাট্য যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে পাশ্চাত্যগণের পূর্ব্বোক্ত মত ভাসিয়া গিয়াছে। তিনি কোন বাহ্যিক প্রমাণের উপর তাঁহার যুক্তি স্থাপন করেন নাই। তিনি বেদগুলি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান পূর্ব্বক যে সকল আভ্যন্তরিক জ্যোতিষিক প্রমাণ পাইয়াছেন, কেবল সেই প্রমাণের উপর তাঁহার মত স্থাপনা করিয়াছেন।

তিনি দেখাইয়াছেন যে, যখন বৈদিক গীতগুলি (hymns) প্রথমে প্রচলিত হইয়াছিল, তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত মৃগশিরা (Orion) নামক নক্ষত্রে হইল। কিন্তু গণনার দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ ৪৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ঐস্থানে হইয়াছিল। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, যখন বেদের ব্রাহ্মণ অংশ প্রচলিত হইয়াছিল, তখন বাসন্তিক ক্রান্তিপাত কৃত্তিকা নক্ষত্রে হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বে শতপথব্রাহ্মণ হইতে দেখাইয়াছি যে, এইরূপ ক্রান্তিপাত খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ বৎসরে সংঘটিত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত কেটকার (Mr. V. B Ketker) তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণের (৩—১—১—৫) অংশ উদ্ধৃত করিয়া গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৬৫০ বৎসরের সময় এইরূপ বৃহস্পতির সংঘটন হইয়াছিল। সুতরাং তিলক যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ বৎসর বলিয়াছেন, তাহার সহিত এই গণনার মিল দেখা যাইতেছে।

তিলক তাঁহার বৈদিক গবেষণার ফলে এইরূপ স্থির করিয়াছেন—"The beginnings of Aryan civilisation must be supposed to date back several thousand years before the oldest Vedic period i.e. 4500 B C"—অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ বৎসরেরও কয়েক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যসভ্যতা স্থাপিত হইয়াছিল।

বৈদিকযুগ সম্বন্ধে তিলক আর আর যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যাঁহারা এতদ্‌সম্বন্ধে সবিশেষ অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা তৎপ্রণীত "Orion" এবং "The Arctic Home in the Vedas" নামক পুস্তকদ্বয় পাঠ করিবেন।

(১) খ্রীঃ পূঃ ১০,০০০ কিম্বা ৮০০০ বৎসর; এই সময়ে আর্য্যদের বাসভূমি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। আর্য্যেরা পূর্ব্বে উত্তর মেরু প্রদেশে বাস করিতেন, কিন্তু প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে আর্য্যভূমি বিধ্বস্ত হওয়াতে,তাঁহারা উত্তর মেরু ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসভূমির সন্ধান করিতে লাগিলেন।

(২) খ্রীঃ পূঃ ৮০০০ হইতে ৫০০০ বৎসর; এই সময়ে তাঁহারা নূতন বাসভূমি স্থাপন করিয়াছিলেন। বাসন্তিক ক্রান্তিপাত এই এই সময়ে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে হইত। বেদের স্থানে স্থানে এ বিষয়ের ক্ষীণ আভাস আছে মাত্র। খ্রীঃ পূঃ ৮০০০০ বৎসরের সময় পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইয়াছিল।

(৩) খ্রীঃ পূঃ ৫০০০ হইতে ৩০০০থ বৎসর; অনেক বৈদিক গীত (hymns) এই

সময়ের প্রাক্‌কালে রচিত হইয়াছিল। বৈদিক সাহিত্যের অনেক স্থলে এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, মৃগশিরা নক্ষত্রদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিল। এ সময় বাসন্তিক ক্রান্তিপাত মৃগশিরায় হইত। গণনার দ্বারায় স্থির হইয়াছে যে, খ্রীঃ পূঃ ৪৫০১ বৎসরে এইরূপ ক্রান্তিপাত হইযাছিল। ঋক্‌বেদের অনেক অংশ এই সময়ে রচিত হইয়াছিল।

(৪) খ্রীঃ পূঃ ৩০০০-১৪০০ বৎসর—এই সময়ে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত কৃত্তিকা নক্ষত্রে হইত। তৈত্তিরিয সংহিতা এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগুলি এই সময়ে রচিত হইয়াছিল। উহারা কৃত্তিকাকে নক্ষত্রের ভিতর প্রথম স্থান দান করিয়াছে। এই সময়ের প্রাক্‌কালে ব্যাসদেব বেদের সকলন করিয়া সংহিতার আকারে পরিণত করিয়াছিলেন।" এই সময়ে শেষ অংশে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হইয়াছিল এবং উহাতে ক্রান্তিপাত গুলির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৫) খ্রীঃ পূঃ ১৪০০-৫০০ বৎসর—এই সময়ের নাম সূত্রযুগ, এই সময়ে দর্শনগুলি সূত্রাকারে রচিত হইয়াছিল।

তিলক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৈদিক কালকে ভাগ করিয়া ৪র্থ বিভাগের ভিতর বেদের সংকলন কাল স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সময়ে ব্যাসদেব যুধিষ্ঠির এবং শ্রীকৃষ্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং ঐ সময়েই গীতা রচিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআশুতোষ দেব।

রামায়ণে রাজনীতি।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাচ্ছলে নারদ অনেক রাজনৈতিক উপদেশ দিয়া ফেলিয়াছেন। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডেও ভরতের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাচ্ছলে এইরূপ উপদেশ দেখিতে পাই। এ উপদেশদাতা স্বয়ং রামচন্দ্র। বর্ত্তমান যুগে এই উপদেশ বিশেষ কৌতূহলপ্রদ বলিয়া ইহার কোন কোন অংশের সঠিক বঙ্গানুবাদ পাঠকের নিকট উপস্থিত করা গেল।

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

"তুমি বীর, বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মতুল্য ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছ ত?" মন্ত্রীর কেবল অন্যান্য [illegible] থাকিলে চলে না; তাঁহার [illegible] আত্মতুল্য হওয়া আবশ্যক।

"তুমি বা তোমার অমাত্য যে মন্ত্রণা প্রকাশ কর নাই, অপরে যুক্তি বা তর্ক দ্বারা তাহা বুঝিতে পারে না ত?" এই মন্ত্রগুপ্তি অনেক স্থলে রাজাদিগের সফলতার এক প্রধান উপায়। আজকালকার সভ্য গবর্ণমেণ্ট পার্লেমেণ্টাদির দ্বারা পরিচালিত হইলেও, সময়ানুসারে মন্ত্রগুপ্তির উপকারিতা বিলক্ষণ বুঝেন।

"তুমি সহস্র মূর্খ অপেক্ষা এক পণ্ডিতকে পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছুক ত? অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে পণ্ডিত তাহা হইতে উদ্ধার করিয়া মহোপকার সাধন করেন।" বঙ্কিম বাবু এ মতের বিরোধী, কিন্তু টোলের পণ্ডিত হয়ত কবির লক্ষ্য নহে। প্রতীচ্য পণ্ডিতেরাই [illegible] বিপুল রাজস্ব বিভাগের কাণ্ডারী।

- "উগ্রদণ্ডে প্রজারা উৎপীড়িত হয় নাই ত?" অপরাধের তারতম্যানুসারে যে দণ্ডের তারতম্য আবশ্যক, তাহা ড্রেকো ও আমাদের বিষ্ণু সংহিতাকার ভিন্ন সকলেই বোধ হয় স্বীকার করিবেন। সভ্য জগৎ রামায়ণের এ নীতি গ্রহণ করিয়াছে; অবশ্য দেশে রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিলে বা কর্তৃপক্ষের মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে, ইহার প্রয়োগ ঠিক থাকে না।

"অর্থ গ্রহণে কৌশল-সম্পন্ন বৈদ্য, অপর ব্যক্তিকে দূষিত করে, এমন ভৃত্য এবং রাজ্যসম্পদাকাঙ্ক্ষী শূরকে যে রাজা বিনাশ করেন, তিনি স্বয়ং নিহত হন।" বিশ্বাসঘাতকের জন্য কি কঠোর ব্যবস্থা!

"সৈন্যগণের দৈনিক ও মাসিক বেতন উপযুক্ত সময়ে দাও ত? বিলম্ব ত কর না? সময় মত বেতন না পাইলে ভৃত্যগণ প্রভুর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাঁহার নিন্দা করে ও অনর্থ বাধায়।" মোগল সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থা এবং হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফর এই নীতির সত্যতার জলন্ত প্রমাণ।

"প্রধান প্রধান স্বকুলস্থ ব্যক্তি তোমার প্রতি অনুরক্ত ত? তোমার কার্য্যের জন্য তাঁহারা একত্র প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ত?" বিভীষণকে সন্তুষ্ট রাখিলে রাবণের এবং মিরজাফরকে সন্তুষ্ট রাখিলে সিরাজের কি দশা ঘটিত, তাহা কে বলিতে পারে?

ইহার পর গুপ্তচরের প্রয়োজনীয়তা বর্ণন। হিন্দুরাজ্যে গুপ্তচরের মাত্রা কিছু অতিরিক্ত ছিল। এখনও কোন কোন দেশীয়-রাজ্যে এ নীতি লঙ্ঘন করিতে প্রস্তুত নহে।

"নিষ্কাশিত শত্রুগণ পুনরায় আক্রমণ করিলে তাহাদিগকে দুর্ব্বলজ্ঞানে অবজ্ঞা কর না ত?" এই অবজ্ঞা যে কত রাজার অকালে পতন ঘটাইয়াছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিলে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যায়।

ইহার পর অযোধ্যাপুরীর সুরক্ষণের উপদেশ দিয়া রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "কৃষি ও গো-পালন যাহাদের জীবিকা, তাহারা তোমার প্রিয় ত? তাহারা বাণিজ্যে সুখী হইতেছে ত?" কৃষি ও বাণিজ্য-পরায়ণ লোকেই যে সমৃদ্ধ রাজ্যের ভিত্তি, তাহা পুরোহিতপীড়িত দেশেও অস্বীকৃত ছিল না।

"তুমি স্ত্রীগণকে সান্ত্বনা ও রক্ষা কর ত? তাহাদের বাক্যে ত শ্রদ্ধা কর না? গুপ্তকথা ত তাহাদের নিকট বল না?" এ সেই চাণক্যের নীতি,—

"বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।"

সভ্য ইউরোপের স্পর্দ্ধাও এপর্য্যন্ত স্ত্রীলোককে পুরুষের সমকক্ষ করিতে পারে নাই।

"প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে উত্থিত হইয়া বিভূষিত-শরীরে রাজ-পথে সাধারণকে দর্শন দাও ত?" রাজাকে মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে, ভক্তি আকর্ষণ করিতে হইবে, অথচ প্রত্যক্ষভাবে প্রজার অবস্থা জানিতে হইবে। ইংলণ্ডে রাজকার্য্য বিভক্ত হইয়া মর্য্যাদা-রক্ষা সম্রাটের এবং অবস্থা জানা প্রধান মন্ত্রীর কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

"তোমার কর্ম্মচারীরা নিঃশঙ্ক ভাবে নিকটে উপস্থিত হয় না ত? অথবা তোমার চক্ষুর অন্তরালে থাকে না ত? এক দুইয়ের মধ্যম অবস্থাই শ্রেয়।" যাহাদের সহিত সর্ব্বদা কাজ, তাহারা নিকটে আসিবে অথচ ভয় করিবে—এ নীতি কেবল রাজার নহে, প্রভুমাত্রেরই অবলম্বনীয়। ভৃত্যের কার্য্য

পর্য্যবেক্ষণে বিশেষ হিসাব চাই; ভৃত্য যেন দৃষ্টি অতিক্রম না করিতে পারে, কিন্তু প্রভু সময় বিশেষে তাহার কার্য্য দেখিয়াও দেখিবেন না।

"তোমার দুর্গগুলি ধন, ধান্য, অস্ত্র, জল, যন্ত্র, শিল্পী ও ধনুর্দ্ধর দ্বারা পূর্ণ আছে ত?" যুদ্ধ না করিলেও রাজাকে প্রত্যহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়, ইহা সনাতন রাজনীতি।

"তোমার আয় অপেক্ষা ব্যয় অল্প ত? অপাত্রে দান করিয়া কোষ শূন্য করিতেছ না ত?" সম্রাট্ অশোক যে ভাবে বৃদ্ধ বয়সে দান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, রাজনীতি তাহার বিরোধী।

"শাস্ত্রকুশল বিচারক কর্তৃক যাহার দোষ স্থিরীকৃত না হয়, এরূপ লোক লোভ-বশতঃ হত হয় না ত?" রাজার যথেচ্ছাচারে বাধা দিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে বহু ব্যবস্থা আছে। এটাও সেইরূপ একটা ব্যবস্থা। প্রাচীন ভারতে বিচার কার্য্যের যথা-সম্ভব সুবিধান ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি শাসন বিভাগীয় কর্ম্মচারীর যথেচ্ছ দণ্ডের পাত্র ছিল না।

"উপযুক্ত কারণে ধৃত ও জিজ্ঞাসিত চোরকে ধন-লোভে মুক্তি দেওয়া হয় না ত?" পুলিশ চিরকালই সমান। তাহার কার্য্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টির আবশ্যকতা, বোধ হয়, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই, স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

"ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিবাদ বাধিলে তোমার নীতিজ্ঞ অমাত্যগণ অর্থলিপ্সাশূন্য হইয়া বিচার করেন ত?" টীকা নিষ্প্রয়োজন।

"মিথ্যা মোকদ্দমায় দণ্ডিত ব্যক্তির অশ্রু, সুখভোগেচ্ছু শাসনকর্ত্তার পুত্র ও পশুকুল বিনষ্ট করে।" এ সেই প্রতীচ্য ব্যবহার-নীতি, দোষী খালাস পায় পাউক, নির্দ্দোষ ব্যক্তি যেন দণ্ড না পায়। শাসনকর্ত্তা কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিবেন, অর্থ বা আয়াসের জন্য অবিচার করিয়া বসিবেন না।

"তুমি সুখের লোভে অর্থদ্বারা ধর্ম্মকে, এবং ধর্ম্মদ্বারা অর্থকে, অথবা কাম দ্বারা উভয়কে বাধা দিতেছ না ত? ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে বিভক্ত করিয়া যথাকালে তিনেরই সেবা করিতেছ ত?" রাজাদিগের সাধারণ মানবের আদর্শ হওয়া চাই—এক দেশ-সেবী হইলে চলিবে না; ধর্ম ও অর্থের সেবা ত চাই, ন্যায্যভাবে কামের সেবাও তাহার বিষয় বুদ্ধি স্থির রাখার জন্য প্রয়োজন। মিশর দেশীয় এক রাজা বলিতেন 'মধ্যে মধ্যে জ্যা খুলিয়া না দিলে ধনুক অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।"

"নাস্তিকতা, মিথ্যাকথা, ক্রোধ, অসাবধানতা, দীর্ঘসূত্রতা, জ্ঞানিগণের সহিত সাক্ষাৎ না করা, আলস্য, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, রাজ্যের আবশ্যক বিষয়ে একাকী চিন্তা, অব্যবসায়ী লোকের সহিত মন্ত্রণা, স্থিরীকৃত কার্য্য আরম্ভ না করা, মন্ত্রণা ভঙ্গ, মাঙ্গল্য কর্ম্মের অননুষ্ঠান, নানা দিক স্থিত শত্রুর বিরুদ্ধে এককালে উত্থান, এই চতুর্দশ রাজ-দোষ বর্জ্জন করিতেছ ত?" ইহার প্রত্যেক কথায় অমূল্য উপদেশ নিহিত।

তারপর নানাবিধ দোষ ও গুণের উল্লেখ করিয়া রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি এগুলি জান ত?" এই উপলক্ষে আমরা পঞ্চবিধ দুর্গ, বিবিধ বর্গ, বিবিধ বিদ্যা, বিবিধ দৈব ও পার্থিব উপদ্রব, এবং বিবিধ মানব-প্রকৃতির উল্লেখ দেখি। কিরূপ লোকের

সহিত সন্ধি না করিয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য, মন্ত্রীর গুণ ও সংখ্যা কেমন হইবে, ইত্যাদি বিবিধ আবশ্যক ও অনাবশ্যক উপদেশ দেখিতে পাই। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারত-ভূমিতে রাজনীতি চর্চ্চা কত উন্নত স্তরে আরোহণ করিয়াছিল।

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ভারতধর্ম্মমণ্ডলের আবেদন পত্র।

ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডল বহুবিধ হিতকর কার্য্য করিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু যে ভাবে ইহার কার্য্যপ্রণালী পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কোন কোন বিষয়ে কিছু উপকার সাধিত হইয়া থাকিলেও, বিবেচক সুধীবর্গ কখনই ইহার সর্ব্ববিধ কার্য্যপ্রণালীর অনুমোদন করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মমণ্ডলের মুখপত্র "ধর্ম্ম-প্রচারক" যেভাবে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে এবং ইহাতে যে শ্রেণীর প্রবন্ধ স্থান পাইতেছে, তদ্দ্বারা জনসংঘের মধ্যে ঐক্য এবং সখ্য সংস্থাপনের জন্য চেষ্টার পরিবর্ত্তে, ভেদনীতির বীজই উপ্ত হইতেছে। ইহার অনেক প্রবন্ধই সঙ্কীর্ণতা ও তরলচিন্তা দ্বারা পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ, যে ভাবে প্রবন্ধগুলি ব্যক্তি বা সমাজবিশেষকে আক্রমণ করিয়া থাকে এবং কটূক্তি প্রয়োগ করে, তাহা অত্যন্ত আপত্তিজনক।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই ভারতধর্ম্ম-মণ্ডলের একটী কীর্ত্তি-কাহিনী পাঠকবর্গকে উপহার দিব। ইহা হইতেই সুধীসমাজ বুঝিতে পারিবেন যে, ভারতধর্ম্মমণ্ডল কি প্রকারে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ধর্ম্মমহামণ্ডলের কতিপয় ভদ্র-লোক, ভারতবর্ষীয় সমগ্র হিন্দুপ্রজাগণের পক্ষ হইতে, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট শ্রীযুক্ত সার এণ্ড্রু ফ্রেজার মহোদয়ের সমীপে এক খানি দীর্ঘ আবেদন-পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। যদি এই আবেদন-পত্র সাধারণ হিন্দুপ্রজামণ্ডলীর নামে প্রেরিত না হইত, তাহা হইলে আমাদের তৎসম্বন্ধে কোনই বক্তব্য থাকিত না। কিন্তু আবেদনকারীগণ আপনাদের সংখ্যার অল্পতা উপলব্ধি করিয়া, সংখ্যাগত এই অল্পতা চাপা দিয়া, সমগ্র হিন্দু প্রজাবর্গের নামে ঐ আবেদন রাজসমীপে দাখিল করিয়াছেন। শ্রীধর্ম্মমণ্ডলের নেতৃগণের পক্ষে এরূপ করা নিতান্ত অবৈধ হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। নিতান্ত গোঁড়ামি এবং আবদারপূর্ণ এই আবেদনপত্রখানি ন্যায়পরায়ণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যদি উপেক্ষিতও হয়, তথাপি প্রজামণ্ডলীর পক্ষ হইতে ইহার প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।

উক্ত আবেদনপত্রে গভর্ণমেণ্টের দুইটী কার্য্যের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। (১) মাননীয় সর্ব্বজনপ্রিয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত ডাক্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়কে "সংস্কৃত উপাধি-পরীক্ষক" সভার সভাপতি নিয়োগ। (২) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহোদয়কে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ প্রদান।

মহামণ্ডলের আপত্তি সংক্ষেপতঃ শ্রীযুক্ত আশুতোষ সরস্বতী মহাশয়ের সম্বন্ধে এই ঃ—

(১) আশুবাবু সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন। (২) তিনি তাঁহার বাল-বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। এই দ্বিতীয় আপত্তি এইজন্য যে (ক) বিধবা-বিবাহ ধর্ম্ম শাস্ত্রনিষিদ্ধ ও প্রচলিত রীতিবিরুদ্ধ, তিনি এই কার্য্যদ্বারা অধ্যাপকমণ্ডলীর অপ্রিয় হইয়াছেন। (খ) এই সভাপতিত্ব একটী 'সামাজিক' ব্যাপার, সুতরাং আশুবাবু দ্বারা তাহা সাধিত হইতে পারিবে না। অতএব আশুবাবুর নিয়োগে স্বধর্ম্মনিরত হিন্দুদিগের মনে একটা উৎকট ভীতি উৎপাদন করিয়াছে এবং পণ্ডিতমণ্ডলী মনে করিতেছেন যে আশু বাবুর হস্তে তাঁহাদিগের পাণ্ডিত্যের সম্মান হইবে না ইত্যাদি।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্বন্ধে ধর্ম্মমণ্ডলের আপত্তি এইরূপঃ—

(১) সতীশবাবু অতি অল্পবয়স্ক, তাঁহার বয়স প্রায় ৩৮। (২) রাজকার্য্যেও তিনি উচ্চপদস্থ নহেন। (৩) তাঁহার সংস্কৃতভাষায় পাণ্ডিত্য কিছুই নাই বলিলেও চলে। (৪) প্রধান কথা, তিনি আচার্য্য বা 'গ্রহ-বিপ্র', অতএব হিন্দুসমাজে সম্মানার্হ নহেন। অতএব—

মহামণ্ডল ছোটলাটকে বর্ত্তমান অশান্তির ভয় দেখাইয়া বলিতেছেন যে, ডাক্তার আশুতোষবাবুকে উপাধি পরীক্ষক সভার সভাপতি পদ হইতে অপসারিত করিয়া, অপর কোন সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতজ্ঞ ভারতবাসীর নিয়োগ হউক এবং বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ না করিয়া, এ দেশীয়গণের বিশ্বাসপাত্র একজন সৎকুলজ ব্রাহ্মণসন্তানকে উক্তপদে নিযুক্ত করা হউক। প্রথমোক্ত পদে শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টরকে নিযুক্ত করিলেই ভাল হয়।

যদি এই আবেদনপত্র সংবাদপত্রে মুদ্রিত না হইত, তাহা হইলে আমরা কদাপি বিশ্বাস করিতে পারিতাম না যে, এই বিংশশতাব্দীতে কোন শিক্ষিত ব্যক্তি গভর্ণমেণ্টের নিকটে এরূপ অসার যুক্তিপূর্ণ, গোঁড়ামী-সর্ব্বস্ব আবদার করিতে পারেন!! ভারত-মণ্ডল কিন্তু তাহাই করিয়াছেন। হায়! যখন "ভারত ধর্ম্মমহামণ্ডল" স্থাপিত হইবার সংবাদ আমরা পাইয়াছিলাম, তখন আমাদের মনে কত আশার কথাই উদিত হইয়াছিল! ভাবিয়াছিলাম—বুঝি বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কলহে সতত ছিন্ন-ভিন্ন ভারত একতাসূত্রে বদ্ধ হইবে, বুঝি ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্ম-সম্প্রদায়সমূহ উদার, বিশাল, পবিত্র-শান্তিময় এক মহাধর্ম্মে একীভূত হইবে! কিন্তু হায়! আমরা ধর্ম্মমণ্ডলের ক্রিয়া-কলাপের উপরে লক্ষ্য রাখিয়া দেখিয়াছি যে, উহার নাম ব্যর্থ হইয়াছে।

কিন্তু আমরা এ প্রবন্ধে ধর্ম্মমণ্ডলের অন্যান্য কার্য্যের আলোচনা করিব না। এবার মহামণ্ডল যাহা করিয়াছেন, তাহার তুলনা দুর্লভ!! আমাদের ভয় হইতেছে, শাসক-সম্প্রদায়, রাজার জাতি, ইংরাজগভর্ণমেণ্ট—এই আবেদনে আমাদিগকে কতই না অবজ্ঞা করিতেছেন!!

মহামণ্ডল আপত্তি করিতেছেন,—বরং ইংরেজ ডাইরেক্টরকে সংস্কৃত পরীক্ষক সভার সভাপতি কর, তথাপি আশুবাবুকে করিও না! আশুবাবুর অপরাধ কি? প্রথম, অপ-

রাধ—তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ!! দ্বিতীয় অপরাধ—তিনি নিজ বালিকা বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন!! তৃতীয় অপরাধ—তাঁহার হস্তে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সম্মান ও আদর থাকিবে না!! ইংরেজ ডাইরেক্টর নিশ্চয়ই সংস্কৃতে অভিজ্ঞ, এবং তিনি কদাপি নিজ বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না!! তাঁহার দ্বারা সামাজিকতাও বেশ রক্ষিত হইবে!! হায়! হায়! কি অস্বাভাবিক অন্ধতা! যে গোঁড়ামী মোগলসাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছে, যে গোঁড়ামী ক্যাথলিক ধর্ম্ম ও ধর্ম্মাচার্য্য রাজরাজেশ্বর পোপের প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত করিয়াছে,—সেই সর্ব্বশক্তিমান্ গোঁড়ামী যে কয়জন 'স্বধর্ম্মনিষ্ঠ' হিন্দুসন্তানকে অন্ধ করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আবেদনকারিগণের মধ্যে কেহ কি আশুবাবুর সংস্কৃত-বিদ্যার পরীক্ষা লইয়াছেন? তাঁহাকে "সরস্বতী" উপাধি কে দিয়াছিল? "নবদ্বীপ বিদগ্ধজননী সভা" কি বঙ্গদেশের শীর্ষস্থানীয় পণ্ডিতবর্গের সভা নহে? ঐ সভার সভাসদগণ যে আশুবাবুকে তাঁহাদিগের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই ত প্রমাণ হইতেছে যে, আশুবাবু সংস্কৃতে সুপণ্ডিত। আসল কথা এই যে, আশুবাবু হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়া, শাস্ত্রের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য, প্রচলিত কুসংস্কারের ও শাস্ত্রানভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন;—তাই তিনি আজ ধর্ম্মমণ্ডলের চক্ষে অনুপযুক্ত!! বালিকা বিধবার বিবাহ অশাস্ত্রীয়,—ইহা সত্য কথা নহে। মহর্ষি মনু, বশিষ্ঠ, পরাশর প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় বরেণ্য আচার্য্যগণ যে বিবাহকে বৈধ বলিয়া গিয়াছেন, তাহাকে কাহার সাধ্য যে অশাস্ত্রীয় বলিয়া প্রমাণ করিবে? আশুবাবুর মত সচ্চরিত্র, বিদ্বান্, বিদ্যানুরাগী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ কয়জন ব্রাহ্মণ বঙ্গে সুলভ? যিনি সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগের কর্ণধাররূপে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সাদরে নিয়োজিত, তিনি সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষক সভার সভাপতি হইবার যোগ্য নহেন, ইহা অপেক্ষা হাস্যাস্পদ সিদ্ধান্ত আর কি হইতে পারে? বর্ত্তমান বর্ষে সংস্কৃত পরীক্ষকদিগের যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, আশুবাবুর হস্তে বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত অধ্যাপকমণ্ডলী কতদূর সম্মান ও আদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ধর্ম্মমণ্ডল আর এক আপত্তি করিয়াছেন যে,—অধ্যাপকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশুবাবুর কন্যার বিবাহে প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, আশুবাবু তাঁহাদিগের বা তাঁহাদের ছাত্রগণের প্রতি অবিচার করিবেন!! এ প্রকার আপত্তি দেখিয়া লোকে ধর্ম্মমণ্ডলকে কি ঈর্ষাবুদ্ধি প্রণোদিত বলিয়া মনে করিবে না? আশুবাবু হাইকোর্টের জজ। ঐরূপ অধ্যাপকদিগের কাহারও কোন মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে গেলে, তাঁহারা বোধ হয় আপত্তি তুলিবেন যে, তাঁহাদের মোকর্দ্দমার বিচার হাইকোর্টে হইলে নিতান্ত অবিচার হইবে!!! আমরা বিলক্ষণ অবগত আছি যে, বিগতবর্ষে যে দুই একজন অধ্যাপক প্রকাশ্যে আশুবাবুর প্রতিকূলে মত দিয়াছিলেন; বর্ত্তমান বর্ষে আশু বাবু তাঁহাদিগকেই পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। মহামণ্ডলের এই সকল অকিঞ্চিৎকর আপত্তির মূলে ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা বর্ত্তমান আছে—এইরূপ সন্দেহই স্বতঃ মনে উদিত হয়।

সতীশবাবুর নিয়োগ সম্বন্ধে আপত্তি দেখুন:—

সতীশ বাবু অল্পবয়স্ক, সুতরাং তিনি

অযোগ্য। লর্ড কার্জ্জন তদপেক্ষা অল্পবয়সে ভারত সাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি হইয়া আসমুদ্রহিমাচল এই মহাদেশ শাসন করিতে সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন,—তখন মহামণ্ডল কোথায় ছিলেন? যে দেশের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন—

"ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ সনো মহান্।"
১৫৪।২।মনু।

"বয়সে, শুক্লকেশে, ধনে কিম্বা সম্বন্ধে মহান্ বা বড় হওয়া যায় না, যিনি জ্ঞানবান্ ও বিদ্বান্ তিনিই মহান্।"—সেই দেশে এখন কথা উঠিতেছে যে, সতীশ বাবুর মোট ৩৮ বৎসর বয়স, তাঁহাকে কি অধ্যক্ষ পদ দেওয়া যায়! মহামণ্ডলের অপর যুক্তি,—সতীশ বাবু সংস্কৃত মোটেই জানেন না! আবেদনকারিগণ যদি নাম-স্বাক্ষর করিতেন, তাহা হইলে বুঝা যাইত, যাঁহারা একথা বলিতেছেন, তাঁহাদের সে বিষয়ে আদৌ অধিকার আছে কিনা। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় নিতান্ত নিপুণ এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষার বিদ্যা সমূহে নিষ্ণাত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র সংস্কৃত জানেন না,একথা কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি বলিতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ধারণা ছিল না। ডাক্তার বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ বলায় তাঁহার অবমাননা হয় নাই;—বিশ্ববিদ্যালয়, গবর্ণমেণ্ট এবং স্বয়ং ভারতী দেবী অবমানিত হইয়াছেন। ইহাতে কেবল যে আবেদনকারিগণ পাপভাজন হইয়াছেন,তাহা নহে, আমরাও পাপের অংশভাক্ হইয়াছি। ঋষি বলিয়াছেন, "মহান্ ব্যক্তিকে যে নিন্দা করে, সেই কেবল পাপভাক্ নহে, যে শুনে সেও পাপের ভাগী হয়।" সর্ব্বশেষে ঘোরতর আপত্তি সতীশ বাবুর "জাত" লইয়া। তিনি গ্রহ-বিপ্র—সুতরাং অসম্মান-ভাজন! ইংরাজ-রাজ্যে আমরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রাজপদ সমূহের প্রার্থী,—রাজাও সেই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ। মহামণ্ডলও জানেন যে, এই পদে একজন ইংরাজ ও আর একজন কায়স্থ বহু কাল অধ্যক্ষ ছিলেন। মহামণ্ডলের মতে ইংরাজ "ম্লেচ্ছ" ও কায়স্থ "শূদ্রাধম" *। যে সকল ব্রাহ্মণ, শূদ্র বা ম্লেচ্ছের নিকট অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ। তথাপি সে সময়ে কোন আপত্তি হয় নাই। মহামণ্ডলের চক্ষে পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও ত "হিন্দু" নহেন! তাঁহাদের সময়ে কেহ কোন আপত্তি করেন নাই। আর আজ এই আপত্তি কেন? মহামণ্ডলের প্রার্থনা—এক জন চরিত্রবান্, দেশীয় বিদেশীয় শিক্ষাসম্পন্ন, বিশ্বাসভাজন, সংকুলজ ব্রাহ্মণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হউন্। আমরা জিজ্ঞাসা করি, সতীশ বাবুর কি এ সকল গুণ নাই? মনুর মতে, চিকিৎসক, গ্রাম্য-যাজক, শূদ্রযাজক, বাণিজ্যজীবী, রাজকর্ম্ম-চারী, সেবা-বৃত্তিপরায়ণ, নিরগ্নিক, বেদজ্ঞান-বিহীন, কুসীদজীবী, শূদ্রাধ্যাপক, মদ্যপায়ী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এত নিন্দনীয় ও নিকৃষ্ট যে, তাঁহারা ব্রাহ্মণ পদবাচ্যই হইতে পারেন না। নক্ষত্রজীবী ব্রাহ্মণ বা গ্রহবিপ্রও এই শ্রেণীর। যদি ছোটলাট বাহাদুর মনুসংহিতা হাতে লইয়া ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচন করিতে বহির্গত হন, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, 'শ্রীভারতধর্ম্ম-মহামণ্ডল' তাঁহাকে একজনও ব্রাহ্মণ দেখা-

* এই সম্বন্ধে মহামণ্ডলের মুখপত্র "ধর্ম্মপ্রচারকে" বিস্তর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

হইয়া দিতে পারিবেন না! শাস্ত্রীয় লক্ষণোপেত ব্রাহ্মণ* আজ কোথায়? মৃগীজাত ঋষ্যশৃঙ্গ, কুশজাত কৌশিক, জম্বুকীজাত জাম্বুক, কৈবর্ত্ত কন্যাজ ব্যাসদেব, বিদ্যাবলে যে ভারতে ঋষিত্বলাভ করিয়া অদ্যাপি পূজিত হইয়া আসিতেছেন, সেই ভারতে আজ মহামণ্ডল "জাত" লইয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছেন!! হায়! হিন্দুধর্ম্মের শিক্ষাগুরুর শূন্য আসন মহামণ্ডল এইরূপেই পূরণ করিবেন!! ভগবন্। ভারতীয় হিন্দুপ্রজাকে মহামণ্ডলের ন্যায় বন্ধুর হস্ত হইতে রক্ষা কর!!

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

মানব সমাজ। (৩)

সমাজ রক্ষা ও তাহার উন্নতিবিধান করিতে হইলে সমাজের সর্ব্ববিধ কর্ম্ম সমাজের মধ্য হইতেই হওয়া আবশ্যক। অপরে কর্ম্ম করিয়া দিলে, ব্যক্তির পক্ষেও যেমন, সমাজের পক্ষেও তেমনি, দিন দিন অলসতা বৃদ্ধি হইয়া অবশেষে জড়তা আসিয়া উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় সমাজ ক্রমেই অধঃপাতে চলিয়া যায়। সমাজের কর্ম্ম সমাজের মধ্য হইতেই হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কর্ম্ম করিবে কে? সমাজস্থ জনগণ কর্ম্ম করিবার যোগ্য হওয়া চাই। তাহারা দেহে ও মনে, সংকল্পে ও শিক্ষায়, উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত হওয়া চাই। এ সকল কিসে হয়, তাহাই বিবেচনা করা আবশ্যক। ইচ্ছা করিলেই ত যোগ্য হওয়া যায় না; আর সকলের ইচ্ছাও হয় না। ব্যক্তি আজিকার পদার্থ নহে। যে পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ সম্মিলিত হইয়া বংশের পর বংশ গঠন করিতেছে, তাহা চিরাতীত কাল হইতে বংশানুক্রমের নিয়ম অনুসারেই স্বকর্ম্ম সাধন করিয়া আসিতেছে।† এ নিয়ম সাধারণতঃ পরিবর্ত্তনহীন।

এস্থলে প্রথমে দেহ গঠনের কথা বিবেচনা করা যাউক; তাহা হইলে মনের বিষয় সহজে বুঝা যাইবে। আর দেহের উন্নতি অবনতির সহিত মনের উন্নতি অবনতি যেরূপ ভাবে জড়িত, তাহাতে দেহের কথাই অগ্রে বিবেচনা করা সঙ্গত।‡ দেহ শুক্র শোণিতের মিশ্রণে জাত। পুংকোষ ও স্ত্রীকোষ অতীব ক্ষুদ্র হইলেও এক একটী মহা ভাণ্ডার। উহাদিগের প্রত্যেক অণুতে কত বংশের কত উপাদান সঞ্চিত রহিয়াছে! উহারা কোষমধ্যে নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে; স্ত্রী ও পুংকোষের অণু সকল পরস্পর মিশ্রিত হইবার সময়েও সে স্থানের বড় বেশি ইতর বিশেষ হয় না। পুংকোষের কতিপয় অণু, স্ত্রীকোষের কতিপয় অণুর সহিত মিশ্রিত হয়, উভয় কোষেরই অবশিষ্ট অণু সকল মিশ্রিত নাও হইতে পারে। যে সকল অণু পরস্পর মিশ্রিত হইতে পারে, তাহারাও ভাঙ্গিয়া গড়িয়া যে কিরূপ পরিণতি (natura-

---

* বজ্র সূচীপোনিষদে ব্রাহ্মণের লক্ষণ দেখুন।

† The molecules of the reproductive protoplasm grow and increase without altering their peculiar nature and without modifying the hereditary tendencies derived from the parents.

Wiesmann's Heredity vol I. p. 24.

‡ Mental and physical degeneration rather go hand in hand. Ibid Vol. II, p. 22.

At present our race is not improving physically, and if not physically it cannot eventually improve mentally.

Rentoul's Race-culture p. 8.

tion) প্রাপ্ত হইবে, তাহা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু যেরূপ পরিণতিই প্রাপ্ত হউক, পুংকোষের অণু সকল ও স্ত্রী-কোষের অণু সকল আপন আপন শক্তি ও প্রবণতা সকল সময় প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। অনেক সময় উভয় কোষ মিশ্রিত পিণ্ডে ঐ সকল শক্তি ও প্রবণতা প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়া যায়। স্ত্রী কোষ ও পুংকোষ মিশ্রিত হইবার সময় ঐ কোষদ্বয়ের অণু সকল যে শক্তি ও প্রবণতা লইয়া আসিয়াছিল, তাহার কিয়দংশ ভ্রূণ দেহে প্রকাশ হয়, অপরাংশ গুপ্তভাবে রহিয়া যায়। এই কার্য্য কোষদ্বয়ের মিশ্রণ সময় হইতেই আরম্ভ হয়। শুক্রকোষের অণু সকল কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তিতে শতধা সহস্রধা বিভক্ত হইতে হইতে অবশেষে তিনটী স্তর গঠিত করিয়া লয়।* তাহা হইতেই অপত্য-দেহ পূর্ণাকারে রচিত হয়।

ইহাই দেহ গঠনের প্রক্রিয়া। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, শুক্র শোণিত-কোষ সকল বংশপরম্পরা ক্রমে যে শক্তি ও প্রবণতা লইয়া মিশ্রিত হইয়াছিল, অপত্য তাহার অধিক কিছুই প্রাপ্ত হইতে পারে না, আর তাহার মধ্যে যে সকল শক্তি ও প্রবণতা প্রচ্ছন্ন রহিয়া গেল, অপত্যের জীবনে সে সকল প্রকাশ লাভ হইতে পারে। অপত্য অনুকূল অবস্থায় পতিত হইলে সে সকল প্রকাশ হওয়া কথঞ্চিৎ সম্ভব, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় প্রচ্ছন্ন শক্তিগুলি ত প্রকাশ হইবেই না, অপর শক্তি-গুলিও পূর্ণরূপে বিকশিত হইবার বাধা পাইতে পারে। স্ত্রী-পুংকোষ মধ্যে যে উপকরণ নাই, তাহা কেহই দিতে পারেন না; যাহা আছে, তাহা প্রকাশ হইতে পারে, না হইতেও পারে।*

এক্ষণে সমাজের প্রয়োজনোপযোগী কর্ম্মের কথা বিবেচনা করুন। অপত্য বংশানুক্রম অনুসারে যে সকল শক্তি ও প্রবণতা লাভ করিয়াছে তদুপযুক্ত কর্ম্ম ব্যতীত অন্য কর্ম্ম সে কেমন করিয়া করিবে? আমি এমন বলিতেছি না যে পুরুষ পরম্পরায় একই কর্ম্ম করিতে হইবে। পূর্ব্ব পুরুষগণ যেরূপ শক্তির সহায়তায় যেরূপ কর্ম্ম করিতেন, পরবর্ত্তিগণ তদ্রূপ শক্তির সহায়তায় অন্য কর্ম্মও করিতে পারেন। কিন্তু অপত্য বংশানুক্রমে যে শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, সে শক্তি দ্বারা যাহা সিদ্ধ হইবার নহে, তাহা অপত্য করিতেই পারে না। তাহার দেহ ও মন যে উপাদান, যে শক্তি ও প্রবণতা লাভ করিয়াছে, তাহা দ্বারা যে কর্ম্ম সিদ্ধ হইতে পারে, সে সেই কর্ম্মেরই উপযোগী; অন্য কর্ম্মের উপযোগী নহে। অন্য কর্ম্ম শিক্ষা দিলেও সে শিক্ষায় সুফল হইবে না, বরং কুফলও হইতে পারে।† কারণ তাহার দেহে যদি অসৎ কর্ম্মের শক্তি ও প্রবণতা প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে তাহা শিক্ষা ও সংসর্গ-দ্বারা বিকশিত হইয়া সমাজের অনিষ্টজনক হওয়ার সম্ভব। এই নিমিত্তই বংশানুক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সক-

* Foster and Balfour. Embryology, 2nd Edition. 323, P P and 271—273.

* We have no experience of any means by which transmission may be made to deviate not from the moment of fertilization can teaching or hygiene or extortation pick out the particles of evil in that zygote, or put in one particle of good

Thomson's Heredity, P. 507

† The so called educating of the mentally backward child in one of the most difficult and one of the most *dangerous* with which we are called upon to deal With them it is not a question of curing their mental defect, because theirs defect is congenital—born with them * * * It is not honest for us to gull the public into believing that these can be really educated Race Culture, P P. 50 51.

নিকেই একটা বাঁধা নিয়মে নানারূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা অতীব অসঙ্গত। বালক বালিকার প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমাজের প্রয়োজনোপযোগী শিক্ষা দেওয়াই সঙ্গত। এ নিয়মের অন্যথায় বর্ত্তমান সময়ে যে কুফল ফলিতেছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তথাপিও বংশানুক্রমের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া জনসাধারণের মধ্যে একই শিক্ষা সমান ভাবে বিস্তার করিবার একটা ধূয়া উঠিয়াছে। ইহা বিজ্ঞানানুমোদিত নহে। প্রাচীন হিন্দুগণও ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

তবেই দেখা যাইতেছে যে,সমাজের উপযোগী কর্ম্ম সকলের নিকট হইতে আশা করা যায় না। শক্তি ও প্রবণতা অনুসারে সমাজের বিভিন্ন জনগণ বিভিন্ন কর্ম্ম গ্রহণ করিবেন, নচেৎ কর্ম্ম সুসিদ্ধ হইবে না। সুতরাং সমাজ ক্রমেই অধোগতি প্রাপ্ত হইবে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হইলে হয় ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবেই না, অথবা অনুষ্ঠিত হইয়াও পরিত্যক্ত হইবে, নচেৎ কার্য্য অসিদ্ধ হইয়া যাইবে। এ স্থলে উপায় কি? সমাজস্থ জনগণ উপযুক্ত উপাদানে গঠিত না হইলে, উপযুক্ত শক্তি অথবা প্রবণতা লাভ করিতে পারেন না। উপাদানের অর্থই বংশানুক্রমিক উপাদান। যে স্থলে কর্ম্মোপযোগী মানুষের অভাব সে স্থলে মানুষ গড়িবার উপায় অবলম্বন করাই উচিত। মানুষ গড়িব কেমন করিয়া? মানুষ ত কাদা দিয়া হাতে গড়িয়া লওয়া যায় না। স্ত্রীপুরুষ দ্বারাই মানুষ গঠিত হয়; সুতরাং এমন স্ত্রী, এমন পুরুষ একত্রিত করিব, যাহারা বংশ পরম্পরায় ঈপ্সিত কর্ম্মের উপাদান দ্বারা গঠিত হইয়া আসিতেছে। এ স্থলে নিম্ন জীবের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। খেঁকী কুকুরকে সাহসী করিব, সুতরাং ডালকুত্তার সহিত তাহার সংযোগ না ঘটাইয়া উপায় কি? তাহা হইলে বাচ্চা সাহসী হইবার আশা করা যায়। এ প্রণালী এত সহজ ও পরিষ্কার ভাবে প্রমাণিত নহে যে, ইহা হইতে সর্ব্বত্রই সুফল হইবে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে যে, বিবাহ দিবার সময় বরকন্যার বংশগত দোষগুণ, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষরূপে প্রণিধান করিয়া কার্য্য করিলে অবশ্যই সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। অযোগ্যের বংশে যোগ্য পুত্র লাভ করিবার অন্য উপায় নাই বলিলেই হয়। মানুষ গড়িতে হইলে বিবাহবিধির উপর লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; কারণ মানুষ গড়িবার অন্য উপায় নাই। কিন্তু যে সমাজে বিবাহক্ষেত্র অতীব সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে সমাজে যোগ্য অযোগ্য ভাবিয়া কার্য্য করিবার অবসর নাই, সে সমাজকে পতিত অবস্থা হইতে রক্ষা করিবার উপায়ও নাই। এ কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

বংশানুক্রমের ত্রিবিধ নিয়ম জানা গিয়াছে; মিশ্রিত, অমিশ্রিত এবং উভচিহ্নিত।* স্ত্রী ও পুংকোষের অণু সকল সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হইয়া এরূপ ভাবে অপত্যের দেহ ও মন গঠিত করিতে পারে যে, উহাদিগের কোন লক্ষণই বুঝা যায় না। উভয়ের লক্ষণ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মিশিয়া যায়। এইরূপ হইলে মিশ্রিত † বংশানুক্রম বলে। অমিশ্রিত বংশানুক্রমের লক্ষণ এই যে স্ত্রী ও পুংকোষের অণু সকল মিশ্রিত হইলেও একের শক্তি ও প্রবণতা এতই প্রবল হয় যে, অপত্য-দেহে উহাই

* Blended exclusive and particulate.

† ইহা কালক্রমে আবার অমিশ্রিতে পরিণত হয়।

প্রকাশ পায়। অপরের শক্তি ও প্রবণতা লুপ্ত হইয়া থাকে। অপর যে স্থলে অপত্য দেহে স্ত্রী-পুংকোষের অণু সকল স্ব স্ব শক্তি ও প্রবণতা পৃথক পৃথক ভাবে প্রকাশিত করে, তাহাকে উভচিহ্নিত বলা যায়। এই ত্রিবিধ বংশানুক্রম অনুসারে অপত্য গঠিত হইয়া থাকে। স্ত্রী ও পুংকোষ পৃথক ভাবাপন্ন হইলে অর্থাৎ এক জাতীয় হইয়াও ভিন্ন দেশোদ্ভব অথবা বিভিন্ন জাতীয় হইলে, অনেক সময় অপত্য উভয় অপেক্ষাই হীন-শক্তি হইয়া থাকে। কখন বা অধিকতর শক্তি-শালীও হয়। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থলে কি ফল উৎপন্ন হইবে, তাহা বংশানুক্রমের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেই বুঝিবার আশা করা যায়। এইরূপে ঈপ্সিত শক্তি ও প্রবণতা যে বংশে সমধিক দৃষ্ট হয়, সেই সম্বন্ধের তাহাই উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ ক্ষেত্রে অপত্য ঈপ্সিত শক্তি ও প্রবণতা লাভ করিবার সম্ভব। কর্ম্ম বংশানুগত নহে, কর্ম্মের উপযোগী শক্তি ও প্রবণতাই বংশানুগত। কর্ম্মের উপযোগী উপাদানও বংশানুগত। তৎপ্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া বিবাহ-ক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণ করিলে সে সমাজের অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়ে। এই নিমিত্তই এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, পতিত সমাজকে উন্নত করিতে হইলে জীবতত্ত্বের নিয়মানুসারে বিবাহ-ক্ষেত্রের প্রসার বিধান করা অত্যাবশ্যক।

সমাজ ভাবিতে গেলেই সমাজের জন-সংখ্যা ভাবিতে হয়। মানুষ না থাকিলে সমাজ কাহাকে লইয়া? জন্মের সংখ্যা, অন্ততঃ জীবিতের সংখ্যা প্রচুর থাকা চাই-ই, বরং কিছু অতিরিক্ত থাকা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। তাহা হইলে জীবন-সংগ্রামের প্রখরতা হেতু সমাজস্থ জনগণের বুদ্ধি ও শক্তি উৎকর্ষতা লাভ করে। * ঐ অতিরিক্ত জন-সংখ্যা উপযুক্ত সীমা অতিক্রম করিলে মরণজনিত হ্রাস উপস্থিত হয়; পুনরায় ঐ সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরূপে জন-সংখ্যা চক্রের ন্যায় উঠা পড়া করে। ইহাতে সমাজের উত্থান পতন হইতে পারে, কিন্তু ধ্বংস হয় না। ধ্বংসের কারণ আলোচনা করা অত্যাবশ্যক এবং ঐ কারণকে দূরে অবস্থান করা অথবা তাহা হইতে দূরে অবস্থান করা সমাজের স্থায়ীত্বের পক্ষেই প্রয়োজনীয়। সমাজধ্বংসের সর্ব্ব প্রধান কারণ জনন-শক্তির হীনতা এবং অকাল মৃত্যু। জনন-শক্তির হীনতা ক্রমে বন্ধ্যাত্ব আনিয়া উপস্থিত করে। অকাল মৃত্যুর প্রধান কারণ পীড়া, আনুষঙ্গিক কারণ বাল্য বিবাহ, খাদ্যের অসদ্ভাব ইত্যাদি। অকাল-মৃত্যু মধ্যে অতিরিক্ত শিশু মরণ বিশেষ আশঙ্কার বিষয়। এক্ষণে এই সকলকে যথাক্রমে আলোচনা করিব।

মানব বহু পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে, কিন্তু চিরাগত আচার ব্যবহার ও প্রথা-পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারে না। এ পরিবর্ত্তন সহজেই জনন-শক্তির হীনতা উৎপাদন করে। যদিও কোন পরিবর্ত্তন জনন-শক্তি বৃদ্ধিকারক, কিন্তু এমন অনেক পরিবর্ত্তন আছে, যাহাতে বন্ধ্যাত্ব আনয়ন করে। † ডারউইন্ বলেন—"অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত জনন শক্তির যেরূপ ভাবে পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়, বিশেষতঃ বানর শ্রেণীর মধ্যে এই পরিবর্ত্তনের ক্রিয়া যেরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহাতে প্রথমে মানবও যে অবস্থার পরিবর্ত্তন বশতঃ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হইত, সেবিষয়ে সন্দেহ করা যায় না।" এই মহাত্মা

* The Evolution of sex, P 249

† Descent of man, P 293 94.

অন্যত্র বলিয়াছেন যে, জাতীয় বিলোপের কারণ অনেক স্থলেই বন্ধ্যাত্ব ও পীড়া, বিশেষতঃ শিশুদিগের পীড়া। ইহা আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইতেই জাত হয়। সে পরিবর্ত্তন সাক্ষাৎ স্বরূপে অনিষ্টজনক না হইলেও উহার ফল অতীব মারাত্মক। * ইহা ব্যতীত, বংশগত পীড়া অথবা দুর্ব্বলতাও জনন-শক্তির হীনতা উপস্থিত করিতে পারে। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জনন-শক্তির হানি করে। পীড়া এবং ব্যক্তিগত দুরাচার বন্ধ্যাত্বের এবং অকাল মৃত্যুর অন্যতর কারণ। তারপর আর এক কথা। জনন-হীনতা অথবা বন্ধ্যাত্ব অনেক সময় ব্যবসায়ের উপরও নির্ভর করে। তীব্র উত্তেজনার বেগে, দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রমে, দিগ্‌দেশে বিস্তৃত হইয়া বাণিজ্যাদি ব্যবসায় আনয়ন করিলে অর্থোপার্জ্জন হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তিগত বন্ধ্যাত্ব ও জাতিগত জনন-হীনতা উৎপন্ন করিয়া থাকে। † জনন-হীনতার এসকল কারণ ব্যতীতও আর একটা কারণ আছে, তাহার নাম দাসত্ব। ইহাতে দেহের ও মনের এরূপ অবসন্নতা আনিতে পারে যে, জনন যন্ত্র তাহা সহ্য করিতে সক্ষম হয় না। পরবশতায় অনেক ইতর জীবেরও বংশহানি হওয়া প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

‡ The most potent causes of extinction appear in many cases to be lessened fertility and ill health specially amongst children arising from changed conditions of life notwithstanding that the new conditions may not be injurious in themselves Ibid p. 284

† In the large cities of America 'hustle hustle' is the cry of commerce and of commerce only ! * ! "hustle hustle" may allow a company to declare a 20 per cent divident and to rush up shares, but it steadily works for sterility and other forms of degeneracy Race Culture, p. 82,

Many nations have fallen and disappeared when their commercial condition was at its zenith. P, 80

বন্ধ্যাত্ব এবং অকাল-মৃত্যুর প্রধান কারণ সকল সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম। ইহার মধ্যে কতিপয় কারণ নৈসর্গিক, অপর কারণ সামাজিক দুষ্ট বিধির এবং ব্যক্তিগত দুরাচারের ফল। এ সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে সমাজ চলিতে পারে, সে ক্রমেই উন্নত হয়; যে না পারে, সে সমাজ অবনত হইয়া পড়ে, এবং কালে লোপ হইয়া যায়। আচার ব্যবহারের আমূল পরিবর্ত্তন করা, কিছুতেই উচিত নহে। এই সাংঘাতিক কারণের গতি রোধ করা কঠিন নহে। বাল্য বিবাহ, ব্যক্তিগত দুরাচার—এ সকলও নিবৃত্ত করা সহজ, কিন্তু খাদ্যের অসদ্ভাব অথবা দাসত্ব, এ দুই কারণের প্রতিরোধ করা সহজ নহে। যাহা হউক, সমাজের প্রথম কথাই স্বাস্থ্য। উপরে যে সকল প্রতিকূল কথা বলা হইল, তাহা ব্যতীতও স্বাস্থ্যের প্রতিকূল আর একটা বিশেষ গুরুতর কথা বিবেচনা করা উচিত। প্রত্যেক সমাজেই অন্ততঃ তিন চারিটী স্তর থাকে—উচ্চ, মধ্যম ও নিম্ন। নিম্ন শ্রেণী হইতে ক্রমে উচ্চ শ্রেণীতে, উচ্চ শ্রেণী হইতে ক্রমে নিম্ন শ্রেণীতে উঠা পড়া হওয়া চাই। সমাজস্থ জনগণ এইরূপে নিম্ন হইতে উচ্চে, উচ্চ হইতে নিম্ন স্তরে উঠা পড়া করিতে না পারিলে সে সমাজ জমিয়া যায়। তাহার জীবনী শক্তি থাকে না। যে জাতির জন-সংখ্যা প্রধানতঃ নিম্নস্তরেই সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ কতকগুলি দরিদ্র, রুগ্ন, অশিক্ষিত, চরিত্রহীন মানব লইয়া যে জাতি গঠিত, সে জাতি অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে না। * এ কথা স্বীকার করি

* If, therefore, a nation has its population recruited not from those who are physically, mentally, financially able to have and to bring up the best stock, but from

যে, প্রত্যেক সমাজেরই অধিকাংশ লোক দরিদ্র, অশিক্ষিত থাকিবে, সন্দেহ নাই। শিক্ষিত, অর্থশালী, বলিষ্ঠ লোকের সংখ্যা সকল সমাজেই অল্প। ইহাঁরাই উচ্চ শ্রেণীর। নিম্ন শ্রেণীতে অর্থহীন, অশিক্ষিতের সংখ্যাই অধিক। কিন্তু আজি যাহারা অর্থহীন অশিক্ষিত, সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর, কালি তাহারা অর্থশালী ও শিক্ষিত হইয়া উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারে, অন্ততঃ উন্নীত হইবার সম্ভাবনাও থাকে, এরূপ বিধান না থাকিলে কোন সমাজই জীবিত থাকিতে পারে না। যে রুগ্ন, অর্থহীন, মূর্খ ....সমাজে তাহার স্বার্থ কি? কোন রূপে তাহার নিজের কালটা কাটিয়া গেলেই হইল। সমাজে তাহার স্বার্থ কি? জীবনে তাহার সুখ কি? এ অবস্থা হইতে এক দিন উন্নত হইতে পারিবে, এমন আশাও যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহা দ্বারা সমাজের কি কাজ হইতে পারে? কিছুই না। উচ্চ শ্রেণীর মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ইহ সংসারের সুখ-ভোগ করুক, কিন্তু সমাজের অধিকাংশ লোক যদি সমাজ রক্ষার বিষয়ে চেষ্টাহীন হইল, তবে সে সমাজ অল্প কালেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কখনই উন্নত থাকিতে পারিবে না। যাহাতে সমাজের অধিকাংশ লোকের মনে সমাজ রক্ষার একটা স্পৃহা উৎপন্ন হয়, তাহা করিতেই হইবে। উন্নতি বিধান করা অল্পেরই কর্ম্ম। কিন্তু স্থির রাখিবার চেষ্টা অধিকাংশের থাকা চাই। যে সমাজে অল্প লোক অধিকাংশকে পদদলিত করিতেছে, সে সমাজ মুমূর্ষু অথবা মৃত।

এস্থলে আর একটী কথা বিবেচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ব্যক্তির ন্যায় সমাজেরও একটা আয়ুষ্কাল আছে। বিভিন্ন জীব-সমাজের আয়ুষ্কালও ভিন্ন ভিন্ন। এই কাল জাতিগত, ইহা প্রত্যেক জীবের পৃথক পৃথক। * প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আয়ুষ্কাল প্রাপ্ত হইয়াছে। ব্যক্তির পরমায়ু অল্প, কিন্তু জাতির পরমায়ু অত্যন্ত অধিক। তাহা হইলেও জাতীয় পরমায়ুরও সীমা আছে। ইহাই সমাজের পরমায়ু। রুগ্ন, অবসন্ন, অল্পায়ু ব্যক্তি সমাজের আয়ুক্ষয় করে। তেমনই চরিত্র-বলহীন, নৈতিক বলহীন ধর্ম্মে পতিত সমাজও দীর্ঘকাল জীবিত থাকিতে পারে না। যাহারা দেহে ও মনে রুগ্ন ও অবসন্ন, তাহারা অপত্য উৎপন্ন করিয়া ভবিষ্যৎ সমাজকেও তদ্রূপ অথবা তাহা অধিক রুগ্ন ও অবসন্ন করিতে না পারে, সেদিকে সমাজের দৃষ্টি থাকা চাই। সমাজস্থ জনগণ স্ব স্ব সদ্বুদ্ধিতেই এরূপ কার্য্য হইতে বিরত হয়, ভাল। নচেৎ সামাজিক বিধি নিষেধদ্বারা তাহাদিগের অপত্যোৎপাদন ক্ষমতা রহিত করা আবশ্যক। জনন-শক্তির বিনষ্ট করিতে কোনই গুরুতর যন্ত্রণা অথবা পীড়া দেওয়া আবশ্যক হয় না; জীবন ব্যাপারেরও বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত করিবার প্রয়োজন হয় না। জনন-শক্তি বিনষ্ট করিলেও ব্যক্তি যেমন সুখস্বচ্ছন্দে ছিল, তেমনই থাকিতে পারে। কেবল বংশ বৃদ্ধি

the poorer classes, what can be expected of the coming race? Nothing but evil

* * No nation can survive if its population be recruited from slum-dem

Ibid P 106.

বাইশ বল্দা তের ছাগলা,
গাছের উর্দ্ধ না যায় হেংলা (কুকুর)
নয়া পাজা বিশা শ
শকুনি হাজার কাক পাঁচ শ।

করতঃ ভবিষ্যৎ সমাজকে অধঃপতিত করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু এ অধিকার বোধ হয় কাহারও নাই। ডাক্তার রেণ্টুল্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ মানবের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি গুরুতর অত্যাচার না করিয়া ভবিষ্যৎ সমাজকে অবসাদের ও ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন।* ইহা বিবেচনা করিবার বিষয়, সন্দেহ নাই।

শ্রীশশধর রায়।

অদ্বৈতবাদ ও ঋগ্বেদের দেবতা।(২)

আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় বলিয়াছি যে, ঋগ্বেদে এক ব্রহ্ম সত্বাই বিবিধ নামে ও বিবিধরূপে স্তুত হইয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমরা কতকগুলি প্রমাণ দিতে চাহিয়াছিলাম, তন্মধ্যে সূর্য্য, ইন্দ্র, সোম, দ্যৌঃ প্রভৃতি দেবতা বা কার্য্যবর্গ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত কিরূপ, সর্ব্বপ্রথমে তাহাই দেখাইবার জন্য প্রতিশ্রুত ছিলাম। ঋগ্বেদে উল্লিখিত দেবতা সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রমাণের উল্লেখ করিব, তন্মধ্যে সর্ব্বাগ্রে বেদান্তদর্শনের কথা বলা আবশ্যক বলিয়া পূর্ব্বসংখ্যায় প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছিল। অদ্য সেই প্রমাণেরই আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ২০ সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় পাদের শেষ পর্য্যন্ত,—এই দুই পাদে আমরা অনেকগুলি সূত্র দেখিতে পাই। এই সূত্রগুলির আবশ্যকতা কি? কেন এই সূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল, সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। উপনিষদের অনেক স্থলে এই প্রকারের কতকগুলি উক্তি নিবদ্ধ আছে—"সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে যিনি জানিতে পারেন, তিনি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হন।" "সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এবং অক্ষিমণ্ডলস্থ পুরুষ একই বস্তু।" "পরিদৃশ্যমান পদার্থ সকল আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় এবং আকাশেই বিলীন হয়।" "আকাশ হইতেই নাম ও রূপ ব্যক্ত হয়।" "দৃশ্যমান ভূতবর্গ প্রাণেই লীন হয় এবং প্রাণের আশ্রয়েই অবস্থান করে।" "সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়-বৃত্তিগুলি প্রাণেই লীন হইয়া যায়।" আকাশের উপরিভাগে যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পাইতেছে, মনুষ্যদেহে জঠরাগ্নিরূপে তাহাই অভিব্যক্ত রহিয়াছে।" "এই জগৎ গায়ত্রীরই অংশমাত্র, গায়ত্রীই সকল।"—ইত্যাদি।

এই সকল শ্রুতিতে সূর্য্য, আকাশ, প্রাণ, জ্যোতি বা অগ্নি, গায়ত্রীছন্দ—প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ আছে। এই শব্দগুলির অর্থ কি? এই শব্দগুলি কি জড়ীয় সূর্য্য চন্দ্রাদি পদার্থকে বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে, না এই শব্দগুলির অন্য কোন অর্থ আছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্যই, বেদান্তদর্শনের পূর্ব্বোক্ত সূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল। এই সূত্রগুলিদ্বারা কি মীমাংসা করা হইয়াছে, এখন আমরা তাহাই দেখিব।

এই সকল সূত্রের প্রত্যেকটীতে ইহাই

* Race Culture, Chap. XX.

মীমাংসা করা হইয়াছে যে, সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি, প্রাণ প্রভৃতি শব্দগুলি দ্বারা জড়ীয় ভৌতিক বস্তু বুঝাইতেছে না। এই শব্দ গুলি ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে। ব্রহ্মই এই সকল শব্দের প্রতিপাদ্য। শ্রুত্যুক্ত সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি প্রভৃতি শব্দদ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইতেছেন। কিন্তু এখন কথা হইতেছে এই যে, সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, প্রাণ— বলিতে ত সকলেই জড়ীয় পদার্থকেই বুঝিয়া থাকে। তবে কেমন করিয়া এই সকল শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইতে পারেন?

ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এই প্রশ্নের দুইরূপ সমাধান করিয়াছেন। প্রথম সমাধান এই যে,—"(ব্রহ্মণঃ) সর্ব্বকারণত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বোপপত্তেঃ।" ব্রহ্মই সকলের 'কারণ'। কার্য্যবর্গের মধ্যে কারণের সত্তাই অনুগত ও অনুস্যূত হইয়া থাকে; এবং কারণ-সত্তাই বিবিধকার্য্যাকার ধারণ করিয়া অবস্থান করে। সুতরাং সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি, প্রাণ প্রভৃতি কার্য্যবর্গ—জগৎ-কারণ ব্রহ্মেরই রূপ। অতএব, সূর্য্যাদি শব্দ দ্বারা, সূর্য্যাদিতে অনুগত ব্রহ্মসত্তাই বুঝিতে হইবে। শঙ্করাচার্য্যের ইহাই প্রথম মীমাংসা। প্রিয় পাঠক, শঙ্করের এই মীমাংসাটী বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। এই মীমাংসাই অদ্বৈত বাদের মূল বীজ। কিন্তু শঙ্করের এই সিদ্ধান্তটী ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, তাঁহার মতে কার্য্য ও কারণের সম্বন্ধ কি প্রকার, অগ্রে তাহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম-পাদে কার্য্য-কারণের তত্ত্ব বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। আমরা এস্থলে অতি সংক্ষেপে শঙ্করের সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়া, আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দৃঢ়তা সম্পাদন করিব। শঙ্কর-মতে, জগতে যত কিছু বিকার, যত কিছু নাম-রূপ, যত কিছু কার্য্য দেখা যাইতেছে, সকলই ব্রহ্ম-সত্তা হইতে অভিব্যক্ত।* ব্রহ্মই জগতের 'কারণ'। এবং এই জগৎ সেই কারণের 'কার্য্য'। কারণ ও কার্য্য—উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ? শঙ্কর বলেন, কারণ হইতে কার্য্যের স্বতন্ত্র সত্তা থাকিতে পারে না। এক কারণ-সত্তাই কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। কার্য্য আর কিছুই নহে, উহা কারণ সত্তারই আকার বিশেষ মাত্র এবং এই একটা বিশেষ-আকার ধারণ করাতে কারণ সত্তাটী কোন স্বতন্ত্র বস্তু হইয়া উঠে না।† মৃত্তিকা হইতে ঘট ও শরাব নির্ম্মিত হইল। ঘট ও শরাব মৃত্তিকারই আকার বিশেষ মাত্র। মৃত্তিকার সত্তাই ঘট ও শরাবের মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছে। মৃত্তিকার সত্তাকে তুলিয়া লও, ঘটও থাকিবে না, শরাবও থাকিবে না। অতএব, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য; ঘট ও শরাবাদি আকারগুলি অসত্য, অর্থাৎ ঘট ও শরাবাদি আকারগুলির নিজের কোন সত্তা নাই; মৃত্তিকার সত্তাতেই উহাদিগের সত্তা। শঙ্করাচার্য্য কারণ ও কার্য্য সম্বন্ধে এই প্রকার মীমাংসা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের নিতান্ত অনুগত সিদ্ধান্ত, পাঠক তাহা বুঝিতেছেন।

* "সর্ব্বস্যৈবাস্য নামরূপ-ক্রিয়াকারকফলজাতস্য যাঽভিব্যক্তিঃ, সা ব্রহ্মজ্যোতিঃ 'সত্তা' নিমিত্তা"—বেদান্তভাষ্য, ১।৩।২২।

† "কার্য্যাকারোঽপি কারণস্য আত্মভূত এব।... ন চ বিশেষদর্শন মাত্রেণ বস্ত্বন্যত্বং ভবতি .. ..স এবেতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ"।—বেদান্তভাষ্য, ২।১।১৮।

এই সকল তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে "উপনিষদের উপদেশ" গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অবতরণিকায় আলোচিত হইয়াছে। এস্থলে অতি সংক্ষেপে কেবলমাত্র সিদ্ধান্তটী প্রদর্শিত হইল।

কার্য্য-কারণের এই তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া, শঙ্করাচার্য্য ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সূর্য্য, অগ্নি, আকাশ, প্রাণ, গায়ত্রী প্রভৃতি কার্য্যবর্গ যখন 'স্বতন্ত্র' কোন বস্তু নহে, উহারা যখন এক ব্রহ্ম সত্তারই বিকাশ বা আকার মাত্র, তখন সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা, উহাদিগের মধ্যে অনুস্যূত সেই ব্রহ্মসত্তাকেই বুঝিতে হইবে। * ব্রহ্মকে 'রূপী' বলা যায়, এবং সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি তাঁহারই 'রূপ।' সুতরাং ব্রহ্ম—'সর্ব্বাত্মক'। অর্থাৎ জগৎ-কারণ ব্রহ্মই সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝান হইয়াছে।

পাঠক, প্রসঙ্গ ক্রমে, এই সিদ্ধান্ত দ্বারা শঙ্করের অদ্বৈতবাদের প্রকৃতিও বুঝিয়া লইবেন। সর্ব্বত্র কেবল এক ব্রহ্ম সত্তাই বিরাজিত রহিয়াছেন। এই সত্তা ব্যতীত আর কিছুই নাই। জগতে যত কিছু পদার্থ বা নামরূপাত্মক কার্য্যবর্গ দেখা যাইতেছে, উহাদের কাহারই স্বীয় স্বতন্ত্র সত্তা নাই। উহাদের মধ্যে এক ব্রহ্মসত্তাই অনুস্যূত, উহারা সেই ব্রহ্ম-সত্তারই বিবিধ রূপ বা আকার বা অভিব্যক্তি মাত্র। তত্ত্বদর্শী পুরুষ সর্ব্বত্র, সকল কার্য্যবর্গের মধ্যে সেই সত্তাটীকেই সর্ব্বদা অনুভব করেন, তাঁহাদের চক্ষে, সেই এক কারণ সত্তা ব্যতীত কোন পদার্থেরই স্বতন্ত্র সত্তা প্রতীয়মান হয় না। শঙ্করাচার্য্য এই অদ্বৈতবাদই প্রচার করিয়াছিলেন এবং তিনি ঋগ্বেদ হইতেই ইহার মূল সূত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি বেদান্ত ভাষ্যের একস্থলে বলিয়াছেন যে,—"যাঁহারা ঋগ্বেদাধ্যয়নকারী, তাঁহারা সর্ব্বত্র অনুস্যূত এই ব্রহ্মসত্তাকেই তাঁহাদের শাস্ত্রে উপাসনা করেন; যজুর্ব্বেদের আলোচনাকারীগণ অগ্নিরহস্যে এই ব্রহ্মসত্তারই হবন করেন এবং সামগানকারীগণ মহাব্রতনামক যজ্ঞে এই ব্রহ্মসত্তারই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।" †

এতক্ষণ আমরা যাহা আলোচনা করিয়া আসিলাম, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কার্য্যবর্গকে অবলম্বন করিয়া, কার্য্যবর্গের মধ্যে অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাকে বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই, উপনিষদের নানাস্থলে সূর্য্য, অগ্নি, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের ইহাই এক সিদ্ধান্ত। এখন আমরা দ্বিতীয় সমাধানের কথা বলিব।

এই সকল সূত্রেরই ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন যে, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি শব্দদ্বারা যে কোন জড়পদার্থকে বুঝিতে হইবে না, তাহার আর একটী কারণ এই যে, ঐ সকল শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক অনেক বিশেষণ রহিয়াছে। সেই বিশেষণ গুলি কখনই জড়পদার্থের উপরে ব্যবহৃত হইতে পারে না। যেমন, কোন স্থলে 'আকাশকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, "সকল ভূতবর্গ আকাশ হইতেই অভিব্যক্ত হয়, আকাশেই লীন হইয়া যায় এবং আকাশের আশ্রয়েই সতত অবস্থান করে।" এস্থলের 'আকাশ' শব্দ যে স্পষ্টই

* "তস্মাৎ গায়ত্র্যাখ্য বিকারেঽনুগতং জগৎ-কারণং ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টং "তদিদং সর্ব্বমি"ত্যুচ্যতে। যথা "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"ইতি। কার্য্যঞ্চকারণাৎ অব্যতিরিক্তমিতি বক্ষ্যামঃ।"

† "বিকারদ্বারেণ ব্রহ্মণ উপাসনং দৃশ্যতে—এতংহ্যেব বহ্বৃচা মহতি উক্‌থে মীমাংসন্তে, এতমগ্নাবধ্বর্য্যবঃ। এবং মহাব্রতে ছন্দোগা ইতি।"—বেদান্ত-ভাষ্য, ১।১।২৫।

ব্রহ্মবাচক, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কেন না, কেবল এক ব্রহ্মপদার্থই তাবৎবস্তুর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। অতএব এই সকল ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ দেখিয়াই বুঝিতে হইবে যে, শ্রুতির উল্লিখিত, সূর্য্য, আকাশ, অগ্নি, প্রাণ প্রভৃতি শব্দ ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে।

আমরা সংক্ষেপে, সূর্য্য, অগ্নি, প্রভৃতি কার্য্যবর্গ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের দুই প্রকার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিলাম। প্রথম সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি, সূর্য্য, আকাশ প্রভৃতি আর কিছুই নহে; উহারা এক ব্রহ্ম-সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম মাত্র। কোন কার্য্যেরই কারণ-সত্তা ব্যতীত 'স্বতন্ত্র' সত্তা থাকিতে পারে না। সুতরাং তত্ত্বদর্শীর নিকটে, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতির স্বতন্ত্র সত্তা নাই; উহারা সেই এক ব্রহ্মসত্তারই নাম-ভেদ বা রূপ ভেদ মাত্র। বেদান্তদর্শনের এই মহামূল্যবান সিদ্ধান্তটার আশ্রয় গ্রহণ করিলে আমরা ঋগ্বেদে উল্লিখিত, সবিতা, দ্যৌঃ, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মরুৎ প্রভৃতি দেবতাবর্গের তাৎপর্য্যও সহজে বুঝিতে পারিব।

সবিতা, দ্যৌঃ, অগ্নি, রুদ্র, প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্রই, ঋগ্বেদের ঋষিদিগের অন্তঃকরণে সেই ব্রহ্ম-সত্তার কথাই জাগরিত হইয়া উঠিত। তাঁহারা সবিতা নামে, দ্যৌঃ নামে, রুদ্রনামে, সোম নামে সর্ব্বত্র অনুস্যূত সেই জগৎ-কারণ ব্রহ্ম-সত্তারই স্তব করিতেন। **কেন না, তত্ত্বদর্শীর নিকটে, কোন 'কার্য্যের'ই কারণ-সত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র সত্তা নাই। কার্য্যবর্গকে অবলম্বন করিয়া, কার্য্যবর্গের মধ্যে** অনুস্যূত ব্রহ্মসত্তাই ঋগ্বেদের একমাত্র উপাস্য বস্তু। এইজন্যই ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ঋষি গাহিয়াছেন—

'ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহু রথো দিব্যঃ স সুপর্ণো, গরুত্মান্।
একং 'সৎ' বিপ্রা বহুধা বদন্তি,অগ্নিংযমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

পণ্ডিতেরা একই সত্তাকে বিবিধ নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। সেই একই 'সত্তা'—ইন্দ্র নামে, বরুণ নামে, মিত্র নামে, মাতরিশ্বা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সেই একই সত্তাকে তত্ত্বদর্শীগণ শোভনপক্ষবিশিষ্ট গরুত্মান্ নামেও ডাকিয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদের ৩২ অধ্যায়ের প্রথমেই এই জন্যই উদ্‌ঘোষিত হইয়াছিল যে—

"তদেবাগ্নি স্তদাদিত্য স্তদ্বায়ু স্তদু চন্দ্রমাঃ।
তদেব শুক্র তদ্ব্রহ্ম তা আপঃ স প্রজাপতিঃ॥

সেই এক-ই বস্তুকে অগ্নি, আদিত্য, বায়ু, চন্দ্র, জল নামে পণ্ডিতেরা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহাকে এই সকল বিবিধ নামে কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে, তিনিই শুদ্ধ ব্রহ্ম; তাঁহাকেই প্রজাপতি বলিয়া জানিবে।

বেদান্তের দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্যটাকে অবলম্বন করিয়াও, আমরা ঋগ্বেদের দেবতাবর্গ যে ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত স্বতন্ত্র বস্তু নহেন, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি। ঋগ্বেদের অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতি যে কোন দেবতার যে কোন সূক্ত গ্রহণ করুন্ না কেন, পাঠক তাহাতেই প্রচুর "ব্রহ্মলিঙ্গ" বা ব্রহ্মের পরিচায়ক বিশেষণ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সে কথা বারান্তরে বলিয়া, বেদান্তদর্শনের অন্যান্য সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিব।

(ক্রমশঃ)।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

নবীনচন্দ্র।

কবি নবীনচন্দ্র আর ইহজগতে নাই। বঙ্গদেশের অঞ্চলস্থা "শৈলকিরীটিনী, সাগরকুন্তলা, সরিৎমালিনী" চট্টলভূমির একপ্রান্ত হইতে যে স্বাধীন স্বভাব গায়ক বঙ্গসাহিত্যের রঙ্গভূমে উপস্থিত হইয়া, চল্লিশ বৎসর উৎকল সঙ্গীতে বাঙ্গালীর হৃদয় মুগ্ধ করিতেছিলেন, আপনার জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, এই লোকে তাঁহার কণ্ঠ চিরতরে নীরব হইয়া গিয়াছে। তৎপূর্ব্বে তিনি বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার শেষ উক্তি—"আজ আমায় বিজয়া।"

বিদায় নহে, প্রস্থান নহে, নির্ব্বাসন বা মুক্তি নহে—বিজয়া? আমাদের শাস্ত্র বলেন, মানুষের চিরজীবনের আন্তর ধর্ম্ম মৃত্যুকালে প্রবল হয়, এবং তাহারই বর্ণে বর্ণিত হইয়া জীবাত্মা পরলোকে প্রস্থান করে। ইহাই "ধর্ম্মস্তমনুতিষ্ঠতি" বাক্যের লক্ষ্য, ইহাই চিত্রগুপ্তের কার্য্য। নবীনচন্দ্রের এই শেষোক্তিতে প্রকৃত মানুষটীর, প্রকৃত কবিটীর অন্তর্গত ধর্ম্মের ছায়া কি পরিমাণে পতিত হইয়াছে, তাহাই অদ্য আমরা চিন্তা করিব। তাঁহার মাহাত্ম্য ও স্বরূপ উপলব্ধি করাই, অদ্য আমাদের শোক প্রকাশের লক্ষণ হইবে, স্বর্গগতের উদ্দেশে কোনরূপ শোকপ্রকাশ আমাদের সমাজধর্ম্মে ইতিপূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। যদিচ, আমরা কালবশে একটা বিদেশী প্রথাকে গ্রহণ করিতেছি, তবে উহাকে অদ্য স্বীয় সমাজের ভাবানুগত করিয়াই গ্রহণ করিব। পরলোকগত মহাত্মাদের চরিত্র চিন্তনে ও মাহাত্ম্য নিরূপণে জীবিতগণের যে লাভ আছে, অদ্য এই শোক সভায় তাহার অংশভাগী হইতে চেষ্টা করিব।

মানুষের প্রকৃত জীবন অদৃষ্ট; অন্ধকারাচ্ছন্ন; বাহ্যদর্শনে তাহার স্বরূপ জ্ঞান জন্মিতেই পারে না। যাঁহারা সত্যকে বা ভাবকে উপলব্ধি করেন বা প্রকাশ করেন—স্থূল কথায়, যাঁহারা কবি বা দার্শনিক, তাঁহাদের জীবনী এই কারণেই মানব সমাজের অমূল্য সম্পত্তি, বিশেষতঃ, কবিগণের সুখদুঃখ, দোষগুণ, কিম্বা পাপপুণ্য, তাঁহাদের সারল্য ও ব্যবসায় ধর্ম্মে, জ্ঞাতসারে অথবা অতর্কিতে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়, উত্তরাধিকারিগণ উহার অনুধাবনে আপনাপন জীবনের পরমার্থ অর্জ্জন করিতে পারে। এই কারণেই কবিজীবনী, হয়ত শতদোষ স্পৃষ্ট হইয়াও, শত শত শাস্ত্র বা অনুশাসন গ্রন্থ অপেক্ষা মহার্ঘ বিবেচিত হয়; এবং কবিগণের গ্রন্থাবলী শিক্ষা ও আনন্দের যুগপৎ সংবিধান করে বলিয়া, পরম যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে; আর কবিগণ মরিয়াও ইহলোকে অমর, বরণীয় ও মহনীয় হইয়া থাকেন।

মানুষের অন্তিমোক্তি অনেক সময় তাহাদের সমস্ত জীবনের মূলতত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছে। সুতরাং অদ্য আমরা সর্ব্বাগ্রে এই কবির অন্তিমোক্তি ও শেষ অভিপ্রায় চিন্তা করিব। কবির শেষ মুহূর্ত্ত, শুনিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়াছিলাম, যাইয়া দেখি, গৃহে লোকারণ্য; রোগী-চর্য্যার সংযতভাব চলিয়া গিয়াছে; অন্ত্যেষ্টির উপকরণ প্রস্তুত করিয়া

সকলেই ব্যাকুলভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে মহা ক্ষণের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, কবি সেইমাত্র দীর্ঘ মোহাবসানে নেত্রোন্মীলন করিলেন, আমাকে দেখিয়া চিনিলেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় বিস্ফারিত হইয়া উঠিল, উৎফুল্ল মুখে কহিলেন "আজ বিজয়া।" কবির মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় স্কুল ছুটী হইয়াছিল, একান্ত দর্শনেচ্ছু ছাত্রগণ গবাক্ষপথে কবিকে দেখিয়া যাইতেছিল। তিনি উহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "বিজয়ার সংবাদ কি সকলেই পাইয়াছে?" পুনর্ব্বার "আজ বিজয়া," কহিতে কহিতে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। তৎপর হইতে নির্ব্বাক, নিস্পন্দ ও সংজ্ঞাহীনভাবে নবীনচন্দ্র আরো দুই দিন বাঁচিয়াছিলেন মাত্র; কিন্তু ভবপুরীর সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ ছিল না। এই ঘটনার পূর্ব্বদিন, নবীনচন্দ্র সহোদরকে তাঁহার শেষ অভিলাষ জানাইয়াছিলেন। তাহা এই, তাঁহার মৃতদেহ অগুরুচন্দনে ও গৈরিক বসনে সজ্জিত করিয়া জন্ম-পল্লীতে লইয়া যাইবেন, মুখ মৃত্যুচ্ছায়ায় অবিকৃত থাকিলে তাহা অনাবৃত রাখিয়া বহন করিবেন; তাঁহার সহধর্ম্মিণী পদব্রজে শববাহনের অনুগমন করিবেন; পিতৃ শ্মশানের পার্শ্বেই তাঁহার অন্তিম শয়ন রচিত হইবে, ও ইহ পরকালের একমাত্র সম্বল-স্বরূপ গীতা গ্রন্থ তাঁহার বক্ষঃস্থলে ও সঙ্গে দিতে হইবে।

এই অপূর্ব্ব অন্তিমোক্তি ও শেষ আশা যতই চিন্তা করি, ততই এই ক্ষণজন্মা পুরুষের সমগ্র জীবনে ও অন্তরতত্ত্বে নব নব আলোক-পাত হইতে থাকে। বলা বাহুল্য, আমি এই আলোচনার শেষ পাই নাই, উহার সীমা নাই, উহা চিরকালের জন্ত অনাগত শত পুরুষের ও সাহিত্যসেবীর কৌতুকলী হইয়া রহিল। মৃত্যুকে লক্ষ্য করিয়া নবীনচন্দ্র বলিয়াছিলেন, 'আজ বিজয়া'। এই বাক্য তাঁহার সমস্ত জীবন মন্থিত করিয়া আপন অর্থসামর্থ্য সংগ্রহ করিয়াছে, ও সহজে, অতর্কিতে বাহির হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের মুখচ্ছবি মৃত্যুর করাল গ্রাসেও বহুক্ষণ বিকৃত করিতে পারে নাই, ঐ কথাটী কহিবার সময় মুমূর্ষুর সেই অম্লান চিরতেজস্ক মুখচ্ছবি যে অপূর্ব্ব তেজঃপ্রদীপে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, তাহা আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। আমার এই স্বল্প জীবনের গুটিকতক উজ্জ্বল স্মৃতির মধ্যে, আমার জন্মভূমির বরপুত্রের এই শেষ দিন, চিরকাল, পরম মহার্ঘতায় দেদীপ্যমান থাকিবে।

কথা একটী পাইয়াছি—'আজ বিজয়া।' 'বিজয়া' কাহার? আমাদের দুর্গোৎসবের বিজয়ার দিন স্মরণ করি, বিজয়ার দিনেই বিসর্জ্জন। সাধক যে প্রতিমা রচনা করে, যাহাতে দেবাধিষ্ঠান উদ্বোধিত করিয়া সাধনা করে, তাহার বিসর্জ্জন। কেন না, চতুর্থদিনে—সিদ্ধির পরদিনে, তাহা মৃত্তিকা মাত্র। নবীন চন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, ঐ দিন তাঁহার সংসার সাধনার শেষ, তাই ঐ দিন তাঁহার বিজয়া। আবার, বিজয়া হর্ষ-বিষাদের দিন। হর্ষ, সাধকের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, বিষাদ, সেই মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তির সাহায্যে চিন্ময়ীকে পাইয়াছে, সেই পরমপ্রিয় কমনীয় মূর্ত্তিকে বিসর্জ্জন করিতে হইতেছে। নবীনচন্দ্রের আত্মাদর অতি প্রবল ছিল। তিনি কবি, তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তিনি অমরতা লাভ করিয়াছেন, এই প্রতীতি, এমন কি, অভিমান তাঁহার জন্মিয়াছিল। তাই, সেই দিন, ভবসাধনার অবসানে তিনি উৎফুল্ল মুখে হর্ষ বিষাদে বলিয়াছিলেন "আজ আমার বিজয়া।"

আবার দেখি, 'বিজয়া' কাহার? জিগীষু বীরের। এই অধঃপতনের দিনে বিজয়ার মাহাত্ম্য আমাদের দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতের সুদিনে বিজয়কামী নৃপতিগণ এই দিনেই বিজয়যাত্রা করিতেন। এই কারণও বর্ষান্ত শুক্লাদশমীর নাম বিজয়া। নবীনচন্দ্র ভবপুরী হইতে নির্গত হইয়া অমরলোকে অভিযান করিতেছিলেন। কবি নবীনচন্দ্রের, প্রকৃত নবীনচন্দ্রের জীবন ঐ দিন হইতেই আরব্ধ হইতেছিল। সাংসারিক দুঃখদৈন্য দুর্বলতার কবল হইতে মুক্ত হইয়া, কবির আত্মা ঐ দিন আপন স্থির জীবন প্রাপ্তির জন্য নিযুক্ত হইতেছিল, নবীনচন্দ্র ঐ অর্থটীও কি চিন্তা করিয়াছিলেন? কিছু করিয়াছিলেন বই কি? ঐ অবস্থার সাংসারিক লোক বলিত—'বিদায়', জ্ঞানী বলিত—প্রয়াণ, যোগী বলিত—"নির্ব্বাণ' বা 'সমাধি'। নবীনচন্দ্র জ্ঞানপন্থী বা যোগী ছিলেন না। সংসারে তাঁহার কিছুমাত্র বৈরাগ্য ছিল না। সাংসারিক ঋদ্ধি ও কবিকার্য্যের কৃতার্থতা লাভই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, উহাই এই বীরপ্রকৃতি, কর্ম্মশীল কবিজীবনের ধর্ম্ম সাধনা ছিল। কবিকৃত্যের মধ্যে ও ভাববিহ্বলতার মধ্যেই তিনি অসীমের ও আনন্দময়ের স্পর্শ অনুভব করিতেন, কাব্যরসে বিভোর হইয়া ভক্তের মত ভাবপুলকিত হইতেন। ইহাই তাঁহার জীবনের ও কাব্যের সাহিত্যতা। স্বকীয় কাব্যের স্থান বিশেষ পাঠ করিতে করিতে তাঁহাকে আত্মবিস্মৃত হইয়া অবিরল ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেও দেখিয়াছি।

মনীষী কবি গেটের শেষ উক্তি "আলোক, আরো আলোক।" সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি কীটসের শেষ উক্তি—"সুন্দর—অতি সুন্দর।" বীরধর্ম্মী ভাবুক কবি নবীনচন্দ্রের শেষ উক্তি—'আজ বিজয়া'। ইহাঁদের প্রত্যেকের শেষ উক্তিতেই, চিরজীবনের অনুসৃত স্বজাত ধর্ম্ম প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। সাধারণের চক্ষে, সংসারজীবনে তাঁহারা স্বাভাবিক দৈন্য দুর্বলতা বশতঃ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের আত্মাপুরুষ সমস্ত সাংসারিক বিবাদ বিক্ষোভের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও যে উন্নত লোক হইতে আপন আহার্য্য সংগ্রহ করতঃ সসার হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কবিগণকে ভাব ও ভাষার সাধনা করিতে হয়, মনকে নিশ্চল বা সংযমাধীন রাখিতে গেলে কাব্য রচনা হয় না, অনন্য-যোগে ভাবের অন্বেষণে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে ও মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গে চিত্ত চালনা করিতে হয়, উহাই কবি জীবনের সঙ্কট স্থান। এই কারণে অনেকের চিত্তও অতর্কিতে চাঞ্চল্য ও বক্রোৎপন্ন হইয়া যায়, অনেকের চরিত্র বা সাংসারিক জীবনও সঙ্কট ও বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া পড়ে। হয়ত, নিজের আদর্শের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসঙ্গত অনভীষ্ট কার্য্যও তাঁহাদিগকে করিয়া বসিতে দেখা যায়। সাধারণ জন মানবের চক্ষে ঐ রূপ কবির জীবন যেরূপই প্রতিভাত হউক না কেন, এই বিশ্ব ভুবনরূপ কাব্যের কবি যিনি, যিনি অন্তঃকরণ তত্ত্বের পরীক্ষায় ভাল মন্দ বিচার করেন, তাঁহার নিকট কবির প্রেতাত্মা যে পরম প্রীতি ও কারুণ্যভাজন হইয়া থাকে, ইহা আমি বিশ্বাস করি। শত দোষ সত্ত্বেও অমার্জ্জনীয় দৈন্য দুর্বলতা সত্ত্বেও, অনেক কবি সংসারে যে উত্তরোত্তর প্রীতি ও পূজা প্রাপ্ত হন, অনেক প্রকৃত সাধু সাধক অপেক্ষাও প্রতিষ্ঠা

লাভ করেন, যেরূপে মরিয়াও অমর থাকিয়া যান, বিভু করুণার ইহাই যথেষ্ট-নিদর্শন নহে কি?

পৃথিবীর সকল প্রকৃত কবির নিকট আপন কবিকর্ত্তব্যই ধর্ম্ম। সকল প্রকৃত কবিই আপন প্রাণের ভাবতন্ময়তার ভিতরে সত্যশিবসুন্দরকে অনুভব করিয়া গিয়াছেন। অপর কোন উপাসনা প্রণালীর একান্ত অনুসরণ আবশ্যক মনে করেন নাই, প্রকৃত কবি যুগপৎ স্রষ্টা ও দ্রষ্টা, তাঁহাদের হৃদয় সহজে আধ্যাত্মিক রাজ্য হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া রসময়ী কবিতার পরিস্ফুরিত করে, অনেকেই যুগপৎ যোগী ও ভোগী। নবীনচন্দ্রও শ্রেষ্ঠ কবি-হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, বৃদ্ধ ব্রহ্মার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্নেহদান তিনি কি প্রকারে আপন কবি কৃত্যে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন, জীবন সাধনাকে কি রূপে মহিমময়ী বিজয়ার দিকে, সার্থকতার দিকে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহাই আমরা অত্য সংক্ষেপে চিন্তা করিব।

নবীনচন্দ্রের আন্তরিক চরিত্র বেগবান ভাবপ্রবণ, সুখে বিহ্বল, দুঃখে অসহিষ্ণু ও যুগবৎ অভিমানী ও সবল ছিল। আমাদের শাস্ত্র এই সকলকে রজোগুণের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করে। বস্তুতঃ এই কবির হৃদয় রজঃ-প্রধান সত্ত্বগুণে পূর্ণ ছিল, তাঁহার 'শেষ আশার' "স্রকচন্দন ও গৈরিক বসনে" সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার জীবনের অন্তরস্থ বীরাদর্শ উদ্ঘাটিত করিয়াছে। সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে কবি হইতে পারে না, নবীনচন্দ্রের কার্য্যাদিতেও যে সাত্ত্বিকতার পরিচয় আছে, তাই উহাও রাজসিক উপকরণ সাহায্যেই প্রকট ও সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তাই গীতা অধ্যয়ন করিতে গিয়া নবীনচন্দ্র গীতার কর্ম্মযোগই বুঝিয়াছিলেন, অধ্যাত্মযোগ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই। আত্ম প্রকৃতি যাহার অনুরূপ বা নিকটবর্ত্তী, তাহাই মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারে, অন্তঃকরণ তত্ত্বের সহিত সামঞ্জস্য না ঘটিলে কবির হৃদয় কোন বিষয়ে কাব্য প্রয়াসে প্রেরিত হইতে পারে কি? তাই কবি নবীনচন্দ্রের সমগ্র জীবনের পরিণত চিন্তার ফল রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মূল উদ্দেশ্য 'ধর্ম্ম সংস্থাপন' নহে, 'ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন'। কবি নবীনচন্দ্র কর্ম্মী; জ্ঞানপন্থার ধ্যান ধারণা সমাধি তাঁহার কোন কালেও মনঃপূত নহে, রজোগুণাপন্ন অর্জ্জুন, দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যে ভৈরব রূপ দর্শন করিয়াছিলেন, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারই আত্মরূপ, কেন না, আত্ম-রূপই বিশ্বরূপ। তৎসঙ্গে নবীনচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি, কেন না, তিনিও স্বয়ং কর্ম্মী, মানুষের পরমার্থ কর্ম্মে, কর্ম্মেই মনুষ্যত্ব, এবং ঐ কর্ম্মের ফল ও কর্ত্তৃত্ব ভক্তিযোগে ভগবানে আরোপ করাই পরম পুরুষার্থ—ইহাই নবীনচন্দ্রের ধর্ম্ম। এই প্রাচীন ধর্ম্ম উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপীয় তমোমিশ্র রাজসিক ভাবের প্লাবনযুগে, সুষুপ্ত ভারতে নূতন করিয়া প্রচার করাই নবীনচন্দ্রের দীক্ষা। আপন প্রকৃতির প্রবল স্বাধর্ম্ম্য-বশেই তিনি এই দীক্ষা লাভ করেন। এই দেশের কবি-সমাজে এই সুমহৎ কর্ত্তব্য গ্রহণে তদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি ছিল না।

নবীনচন্দ্রের প্রতিভাও বীরধর্ম্মাপন্ন ছিল। এই কারণে সমধিক সূক্ষ্মদর্শন বা প্রকাশ অপেক্ষা উহার দ্রুতগতি ও বিপুল শক্তিই সর্ব্বপ্রথমে চিত্তকে আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ করে। এই কারণে নবীনচন্দ্রের কাব্যাদিও সর্ব্বত্র

ভাবের বিপুল উচ্ছ্বাসে, ভাষার ঝঙ্কারে ও উদাত্তমালা প্রাঞ্জলতায় অবকাশ-রঞ্জিনী হইতে অপ্রকাশিত চৈতন্য পর্যন্ত, তাঁহার চরিত্রের সমস্ত সদ্‌গুণে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। নবীনচন্দ্রের সহিত পরিচয় মাত্রেই, যেমন অর্ব্বাচীন ব্যক্তিও তাঁহার সমস্ত গুণ ও দোষের পরিচয় পাইয়াছে, তেমনি, নির্বিশেষ সরলতার দরুণ, তাঁহার সমস্ত কাব্যের গুণ বা দোষও অতি সাধারণ পাঠকের বোধ-গম্য হইয়া আছে।

এই কারণ, কি বহির্জগতে কি অন্তর্জগতে, নবীনচন্দ্র অতি সক্ষ দর্শন করিতেন না; ব্যাপ্ত দর্শন তাঁহার কবিতার মূল তত্ত্ব। ইংলণ্ডীয় কবিগণের মধ্যে কেবলমাত্র বায়রণ ও সেক্সপীয়রই এই গুণের বহুলভাবে অধিকারী ছিলেন। তবে সেক্সপীয়র প্রোক্ত উভয় গুণেরই সমান অধিকারী, বলা বাহুল্য, সাহিত্য-জগতে তৎসদৃশ এতদুভয়ের উচ্চ সমঞ্জসিত শক্তিযুক্ত কবি বিরল। বৃহৎ ভাবকে বৃহৎ-ভাবে বুঝিতে, দ্রুতবেগে বড় বড় তুলিকা সঞ্চালনে তাহার রেখাচিত্র অঙ্কিত করিতে,ও তৎসঙ্গে পাঠকের অনন্যতন্ত্র সহানুভূতি জাগ্রত করিতে নবীনচন্দ্র সিদ্ধ-হস্ত। তাই, সাধা বিষয়ে বিহ্বল ঐকান্তিকতা, প্রাঞ্জল-রস-সমুজ্জল ভাষা নবীনচন্দ্রের লেখনীর নিত্য সহচরী ছিল। অন্যদিকে, স্বয়ং করুণ রাগিণী আলাপের সময়, অকস্মাৎ নিজের সমগ্র প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া ফেলিতে, হাস্যরস জমাইবার সময় অকস্মাৎ আত্মবিস্মৃত হইয়া বিভোর ভাবে হাসিয়া ফেলিতে, মহিমার কথা সমুচ্চ কণ্ঠে আলাপ করিতে করিতে অতর্কিতে স্বয়ং আত্মহারা হইয়া মুগ্ধ ও অজ্ঞান হইয়া পড়িতে, একমাত্র কবি নবীনচন্দ্রেই সম্ভবে। সাহিত্য শাস্ত্রে নাকি ইহা অসঙ্গত—আর্ট বা শিল্পকলা-বিরুদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রের কথা মানে কে? পলাসীর যুদ্ধ, রঙ্গমতী, কি রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসে কবি যে স্থানেই শাস্ত্র অবহেলা করিয়া, যবনিকা মধ্য হইতে স্বয়ং মুগ্ধভাবে নগ্নদেহে বাহির হইয়া আসিয়া অভিনেতৃগণের সঙ্গে মাতিয়া গিয়াছেন, সেইখানেই উহার ফল কবির সাপেক্ষে আশাতীত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। সামাজিকগণ কবির এই অনৌচিত্য বিচার করিবার অবকাশ চাহে নাই, কবির আন্তরিকতায়, সরলতায় ও ব্যক্তিগত সংসর্গে মুগ্ধ হইয়া, আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বাস্তবিক, নবীনচন্দ্রের কবিতার একটা প্রধান সৌন্দর্য্য এই আন্তরিকতা ও আত্ম-সম্পর্ক, (Personal element) পাঠক যেন অন্তরে অন্তরে জানিতে চায়, কবি একটা ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছেন, না সত্য প্রদর্শন করিতেছেন? কবি স্বকৃতির মধ্যে আছেন কি? নিজের কথা নিজে বিশ্বাস করেন কি? এই সকল প্রশ্নে আশ্বাস পাইলে পাঠকগণ যেন প্রীত হয় এবং কবিকৃতির মাহাত্ম্য এই কারণেই অনেক বাড়িয়া যায়। নবীনচন্দ্রের বেলায় এই তথ্যের বহু সমর্থন হইয়া গিয়াছে। বায়রণের কবিতাতেও এই Personal element প্রবল ছিল। তবে, বায়রণের অভিমান, সমাজ ও নীতি-দ্রোহিতা ও বিদ্বেষভাব এত প্রবল ছিল যে, উহাতেই তাঁহার কবিতার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে বরং বিপক্ষতাচরণ করিয়াছে, পাঠকের হৃদয়ে উহা বহুস্থলে এমন বেদনাদায়ক হইয়া গিয়াছে যে, বায়রণের উচ্চমুগ্ধকারী কবিত্ব শক্তিও কুলাইয়া উঠে নাই।

নবীনচন্দ্রের কবিতাতেও প্রথম প্রথম বায়রণের কোন কোন দোষ যে ছিল না,

এমন নহে, তবে, বয়সের প্রৌঢ়তায়, বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় সমাজ-সংসর্গের ফলে, নবীন চন্দ্রের কবিতা হইতে, ঐ সমস্ত দোষ ক্রমে নিরাকৃত হইবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। নবীনচন্দ্রের মতন পরিণত বয়স্ক ও সুস্থিত হইতে পারিলে, ইংলণ্ডের বায়রণও নবীন চন্দ্রের ন্যায় শ্রেয়ো-মুখী সমাজবুদ্ধি ও ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে উপনীত হইতে পারিতেন কিনা, চিন্তার বিষয়। পরন্তু এই উভয় কবির প্রতিভার প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও স্ফুরণ বিচার করিতে বসিলে, উভয়ের নানা স্বাধর্ম্ম্য চিত্তাকর্ষণ করিতে থাকে। অশুভবাদী ও বিদ্বেষধর্ম্মী Manfred, Cain অথবা Heaven and Earth না হইয়া কোন শুভাদৃষ্ট গুণে বাঙ্গালার বায়রণের (?) প্রতিভা রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাসের ও বুদ্ধ চৈতন্যের নিষ্ঠা তত্ত্বকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা সাহিত্যানুরাগী মাত্রেরই পরম কুতূহল ও প্রণিধানের বিষয়। বায়রণ অতি প্রদীপ্ত ধ্বংসশীল উল্কাশিখার মতন স্বপ্রকৃতির অমিতাচার ও স্বাভাবিক ফলেই যেন অকালে নিবিয়া গিয়াছিলেন। আর, ভারতবর্ষীয় নবীনচন্দ্র মিতকর্ম্মা ও সুরক্ষিত থাকিয়া, দ্বিষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত, আপন জীবনকে বিশ্বাসে ও ধর্ম্মে বিকশিত করার সুবিধা পাইয়াছিলেন। যেই ভাবে এই কবির ধর্ম্ম ও সমাজজীবন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার অনুধাবনও প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর বিশেষ কৌতুকাবহ হইবে, সন্দেহ নাই।

আমাদের এই কবি, পণ্ডিত বা কোন বিষয়েই ধৈর্য্যশালী অধীতী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহার পঠিত বিদ্যা কোনরূপেই বহুপ্রসারী বা গভীর ছিল না। প্রথম পরিচয়ে তাঁহার লাইব্রেরীর গ্রন্থাল্পতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছিলাম, সেক্সপীয়রের গ্রীক ও লাটিন বিদ্যা বিষয়ে কবি গ্রীন যে সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন, নবীনচন্দ্রের সংস্কৃত ভাষা ও দর্শনজ্ঞান বিষয়েও এই সাক্ষ্য নির্ভয়ে দেওয়া যাইতে পারে। যে বায়রণের সহিত সচরাচর তাঁহার তুলনা করা হয়, যাঁহার নিকটে তিনি বহু পরিমাণে ঋণী, এমন আশঙ্কাও করা হয়, সেই বায়রণের Child Harold ও Hours of Idleness মাত্র পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন, এই কথা তিনি আমার কাছেই স্বীকার করিয়াছেন। অবকাশ-রঞ্জিনী ও পলাসীর যুদ্ধের পর, আর তাঁহার বায়রণের সহিত কোন সামঞ্জস্যই দেখিতে পাইতেছি না।

তিনি স্বীয় প্রতিভার অদৃষ্টগত সামঞ্জস্য বশেই বায়রণের সমভাবাপন্ন কবি, এই ধারণা আমার দৃঢ়মূল হইয়াছে। আপনার মানসিক শক্তির বিপুল প্রেরণা ও স্বাভাবিক প্রতিভা বশেই এই কবি চকিত বেগে কার্য্য-বিষয় দর্শন করিতেন ও অবলীলাক্রমে তাহা চয়ন করিয়া যাইতেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ইংরাজী শিক্ষা, ইতিহাস দর্শন ও কাব্য চর্চ্চা ও প্রাকৃত সমসাময়িক বঙ্গসমাজের আব হাওয়া হইতে পরিমিত জীবনীরস সংগ্রহ করিয়া এই স্বভাব কবি, আমাদের দেশের অযত্ন-সংবর্দ্ধিত অশ্বত্থ তরুর ন্যায়, আকাশের ঝড়ে ও রৌদ্রে পরিপুষ্ট প্রকাণ্ড ও মহীয়ান্ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এমন অনায়াস-সিদ্ধ ক্ষিপ্রতা, প্রকাণ্ডতা, নিশ্চিন্ত নির্ভীকতা সাহিত্য-জগতে অত্যল্প কবির বেলাতেই পাওয়া যায়। যিনি স্বয়ং পণ্ডিত নহেন, তাঁহার কাব্য অপরকে পাণ্ডিত্য লাভে সহায়তা করিবে; যিনি স্বয়ং নিশ্চিন্ত নিমেষে লিখিয়া যাইতেন,

তাঁহারাই কবিতা অন্যকে গভীর চিন্তায় দীক্ষিত করিবে, শক্তিমাতার সুপ্রকল স্নেহ ও পক্ষপাতিতার ফল না হইলে বর্ত্তমান কালে সাহিত্য জগতে এইরূপ ঘটনা সম্ভব হইত না। আমরা দেখিতেছি, পাশ্চাত্য কবি বা কাব্য প্রথার নিকট মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের ঋণ অনায়াসে স্থির করা যায়, কিন্তু নবীনচন্দ্রের কবিঋণ নির্ভয়ে নিশ্চয় করা দুঃসাধ্য।

আধুনিক য়ুরোপীয় সাহিত্যে একটা নূতন 'হুজুগ' উঠিয়াছে, তাহার মূল মন্ত্র—'art for arts' sake.' উহার মর্ম্ম-আর্ট নিষ্ঠ শিল্পকলা; অর্থাৎ কাব্যসঙ্গীত প্রভৃতি ললিত কলার একমাত্র উদ্দেশ্য অনলঙ্কৃত স্বভাব বর্ণন, অথবা একোদ্দিষ্ট সৌন্দর্য্য সৃজন, কাব্যের কোনরূপ নৈতিক বা শ্রেয়স্কর উদ্দেশ্য রক্ষার নাকি আবশ্যকতা নাই। এই মতের ভাল মন্দ বিচার বর্ত্তমান প্রসঙ্গের বহির্ভূত, সুতরাং এই মাত্র বলিয়া রাখিব যে, ইতিমধ্যে য়ুরোপেই গেটে, টলষ্টয়, রাস্কিন, ম্যাথু আনল্ড প্রভৃতি মনীষীগণ এই মতের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। নবীনচন্দ্রকে এই বিজাতীয় মত স্পর্শ করে নাই। মধুসূদনে উহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিদৃষ্ট হইবে, নবীনচন্দ্র ভারতীয় ঋষি-সেবিত সাহিত্যগঙ্গা হইতেই স্নানপূত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই নবীনচন্দ্র প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় জীবপুঞ্জের বংশধর, দৈবক্রমে ভারতসমুদ্রের তলদেশ হইতে ঝটিকাক্লিষ্ট কবিধাত্রী চট্টল ভূমির উপকূলে উন্নীত হইয়াছিলেন। যাঁহারা পৃথিবীর অন্ধকার যুগে ভারতীয় সাহিত্যে সুবিপুল রামায়ণ, মহাভারত, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ ও শ্রীমদ্ভাগবত রাখিয়া গিয়াছেন, ও পরকালে যাঁহারা চৈতন্যচরিত, চৈতন্য ভাগবত এবং এইদেশে সুবৃহৎ 'জাগরণ' ও 'মনসার পুঁথি' গান করিয়া গিয়াছেন, এই নবীনচন্দ্রের সহিত তাঁহাদেরই শোণিত ও সবর্ণ সম্বন্ধ দেখিতেছি। মধুসূদন ও হেমচন্দ্র শক্তিধর কবি হইয়াও বিদেশীয় প্রভাবে ভারতবর্ষীয় মনুষ্য হৃদয়ের মর্ম্মস্থান চিনিয়া লইতে পারেন নাই ও তাঁহাদের সুবৃহৎ কাব্যদ্বয় য়ুরোপীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের হিসাবে, হয়ত অনবদ্য হইয়াও, বঙ্গসমাজের অন্তরঙ্গ সহানুভূতি লাভ করিতে পারে নাই, স্বভাব কবি নবীনচন্দ্রের বিষয় নির্ব্বাচন, বক্তব্য ও উদ্দেশ্য সুবিহিত হইয়াছিল কি না, বঙ্গদেশের পাঠক-সাধারণ চিরকাল সাক্ষ্য প্রদান করিবে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই, জগদ্ধাত্রী সর্ব্ব প্রথম সেই শক্তি প্রদানে এই কবিকে প্রেরণ করেন, শেষ পর্য্যন্ত তাহা অপরিবর্ত্তিত ও অক্ষুণ্ণ ছিল। নবীনচন্দ্র প্রকৃতি-দত্ত শক্তির ব্যবহার করিয়াছেন মাত্র, কোন রূপে উন্নতি ঘটন অথবা নূতন অর্জ্জন করেন নাই। অবকাশরঞ্জিনীর নবীনচন্দ্রে বা চৈতন্যের নবীনচন্দ্রে মৌলিক কোন পার্থক্যই নাই, এই দীর্ঘ জীবন কবি স্বীয় প্রাবন্ধের দ্বারা তাহার গুণগত কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই, রচনার প্রকৃতি প্রবৃত্তি বা শক্তি একই জাতীয়। ইহাতেই দেখা যাইবে, এই কবির কবিত্ব শক্তির মূল মস্তিষ্কে নহে—হৃদয়ে, এই ক্ষেত্রে প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের সহিত নবীনচন্দ্রের সবর্ণ সম্পর্ক আরও পরিস্ফুট। ভাবে গদগদ, প্রেমে মুগ্ধ নবীনচন্দ্র হৃদয়ের সামর্থ্যেই কাব্য রচনা করিয়াছেন, জীবন পথেও হৃদয়ের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। স্বকৃতি বা পরকৃতি

তিনি হৃদয়ের দ্বারাই বিচার করাইতেন; রসের উদ্দীপনা করিয়া তাঁহার হৃদয় স্পন্দন জানাইতে পারিলেই তিনি মুগ্ধ হইতেন, ও অকপটে অতিশয়োক্তি-বহুল প্রশংসা করিয়া ফেলিতেন। বঙ্গদেশের অনেক নবীন সাহিত্যিক কবির এই অকৃত্রিম সহৃদয়তার ও অনপেক্ষার সাক্ষ্য প্রদান করিবেন। যাত্রার আসরে বা অভিনয়মঞ্চে কোনমতে রসের উদ্রেক করিতে পারিলেই,সর্ব্বাগ্রে নবীনচন্দ্রকে মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত করা কত সহজ হইত, তাহা এই দেশের সকলেই জানেন।

এই হৃদয় ধর্ম্মে নবীনচন্দ্র কখনও নিজের অন্তরতত্ত্বে দৃষ্টি করেন নাই, ভিতরের মানুষটীর প্রতি সবিতর্ক দৃষ্টি নবীনচন্দ্রের প্রণালীবিরুদ্ধ, তাঁহার আত্মজীবনের যে অংশ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবিটী কোথায়? পলাশীর যুদ্ধ,বা রৈবতক বা কুরুক্ষেত্র-প্রণেতা বাল্যজীবনের কোন্ স্থানে আপন প্রাণরস প্রাপ্ত হইয়াছে? উহার বর্ণিত ঘটনাবলীতেও কেবল একটা উদ্ধত, দুর্দ্দান্ত, সুখ দুঃখে অতিপ্রবণ স্বভাবশিশুকে দেখিতেছি, কবি আত্মজীবন বিবৃত করিতে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা এত সরল, নির্ভীক এবং স্বাভাবিক যে, তাহাই অতর্কিতে তাঁহার চরিত্রের মূল বর্ণ প্রকাশ করিতেছে, এই জাতীয় কবির রচনা-রীতিই তাঁহাদের চরিত্রের মূলতত্ত্ব প্রকাশ করে। উহা জীবনযাপনের ইতিবৃত্ত মাত্র; জীবন গঠনের বা দর্শনের নহে। জার্ম্মাণীর গেটে যেমন শৈশব হইতেই আপনার কবিজীবনের প্রতি মালীর ন্যায় সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন, ও নিজকে জীবনের ঘটনা সংঘাতের মধ্য দিয়া জাগ্রতভাবে বাহিয়া নিয়াছেন; নবীনচন্দ্র তেমন কখনও করেন নাই। তিনি অতর্কিত কবি। কথাটী সম্পূর্ণ অর্থবাচক হইল না। নবীনচন্দ্র নিজের অদৃষ্ট ও জীবনদেবতার সানুগ্রহ বিধান বশতঃই কবি। ঘটনাবিধান বিপরীত হইলে, এমন কি, পিতার মৃত্যুর পর সংসার যে তাঁহাকে করাল বক্ত্র বিবৃত করিয়া গ্রাস করিতে চাহিয়াছিল, তাহা পরাবৃত্ত না হইলে, ও উচ্চ রাজকীয় পদ লাভান্তে জীবনোপায় সুখ সুবিধাজনক না হইলে, তিনি কি হইতেন,বলা যায় না। মনীষী কার্লাইল স্বকীয় 'বীর-পূজা' নামক গ্রন্থে যে সমস্ত শক্তিধর সর্ব্বতোভদ্র পুরুষকে 'বীর' নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, নবীনচন্দ্রও এই জাতীয় 'বীর' ধর্ম্মাক্রান্ত ছিলেন। কবিপ্রতিভার প্রবৃত্তি তাঁহার সমগ্র চরিত্রের অনেকগুলি প্রবল প্রবৃত্তির একতম মাত্র, যে যে দিকে ছুটিত, অন্য সকলকে অভিভূত করিয়াই ছুটিতে পারিত। দেখা যাইতেছে, প্রকৃতিপ্রিয় পুত্রকে এই ক্ষেত্রে অনুপমভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রকৃতি পরম স্নেহে ও সাগুণ্যে নবীনচন্দ্রকে হৃদয়ে ও কার্য্যে কবি করিয়া তুলিয়াছিলেন, কেবল কবি নহে, ক্ষণিকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবতরঙ্গে ঝঙ্কৃত—এমন কবিত্ব নহে, তাঁহার সমস্ত জীবনকে সর্ব্বতোভাবে একটা বিশিষ্ট লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত, সমস্ত কাব্যচেষ্টাকে একটা বিশিষ্ট মঙ্গল-লক্ষ্যে প্রেরিত করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থাবলীর মূলতত্ত্বের পর্য্যালোচনায় উহা পরিস্ফুট হয়।

অবকাশরঞ্জিনীর ক্ষুদ্র কবিতা সমূহে কিশোর বয়স্ক ও যুবক নবীনচন্দ্রের অন্তর তত্ত্বের পরিচয় পাই। স্বাধীন উদ্ধত স্বভাব-শিশু, পরিবারের ও স্বদেশের প্রেমে বিগলিত, সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত, ভাবুকতায় উন্মত্ত, সৌহার্দ্দে সকরুণ, কৃতজ্ঞতায় নতশির ও সর্ব্ব-

প্রকার নীচতার প্রতি একান্ত অক্ষমশীল। নবীনচন্দ্র এই দুই কাব্যের প্রতি ছত্রে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। পরিণত বয়সেও তাঁহার চরিত্রের এই সমস্ত মূলবর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। নবযুবক যে স্থানে 'কীর্ত্তিনাশার' কূলে দাঁড়াইয়া বলিতেছে,—

কীর্ত্তিনাশা। বৃথা নাম বৃথা অভিমান,
কি সাধ্য প্রকৃত কীর্ত্তি নাশিতে তোমার?

যে স্থলে কাল প্রবাহে অক্ষত তিন দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্যে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া বিহ্বল হইয়া গিয়াছে, যে স্থলে, সেই ভাবমুগ্ধ পরমৌদ্ধত্যের মধ্যেই ভবিষ্যকবিবরের পরিচয় পাই, সেই স্থলেই প্রকৃত প্রস্তাবে 'পলাশীর যুদ্ধের' বিভাবনা শক্তি প্রকট হইয়াছে।

তারপর 'পলাশীর যুদ্ধ' কেবল প্রতিভার স্বেচ্ছা দৃপ্ত সঙ্গীত, আপাতঃ দর্শনে, উহার কোন লক্ষ্য নাই, কোন নৈতিক ভিত্তি নাই, উহা কেবলি আনন্দ প্রকাশ? কবির হৃদয় আনন্দে নাচিতেছে, কবি হৃদয়ের মধ্যে আত্মপ্রতিভার সমুদ্র কল্লোল ও কামান গর্জ্জন শুনিতেছেন—গান ত অপরিহার্য্য; এখন যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়াই চলুক। বাহতঃ, উদ্দেশ্য ভাবাক্রান্ত নহে বলিয়া পলাশীর যুদ্ধ নববসন্তের উৎকণ্ঠ পিকবরের মতন উজ্জ্বল, মধুর, রসাল; এক শ্রেণীর কাব্য-রসিকের নিকট চিরকাল হৃদয়গ্রাহী, চিরকাল কবির পরবর্ত্তী সিদ্ধ লক্ষ্য গ্রন্থাবলী অপেক্ষাও সমাদৃত।

কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের উদ্দেশ্য আমাদের অবস্থা বৈগুণ্যেই প্রকটিত হইতে পারে নাই। আমরা দেখিব, প্রেম—স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি-প্রেম সর্ব্বত্র নবীনচন্দ্রের প্রতিভার উদ্দীপক শক্তি ও অবলম্বন। মধুসূদনে যে স্বদেশ বা স্বজাতি প্রেমের অভাব, অন্ততঃ পক্ষে অস্ফুটতা, সহৃদয় হেমচন্দ্রে নানাস্থানে যাহার কিংকর্ত্তব্য-শূন্য উত্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস; নবীনচন্দ্রে তাহারই সমঞ্জসিত লক্ষ্যে স্ফূর্ত্তি ও প্রয়াস। বুঝি, ঐ জন্যই, নবীনচন্দ্র কখনও 'মানবত্বের' ভূমি পরিহার করেন নাই, কখনও অনৈতিহাসিক বা অতিমানব ঘটনাবলম্বনে কাব্য প্রণয়নে নিযুক্ত হন নাই। 'পলাশীর যুদ্ধের' অন্তস্থলেও ঐ স্বদেশ-প্রেমই কার্য্য করিয়াছে, কবি উহাই উদ্দীপ্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি—গঠন প্রয়াসী কবি; বায়রণ বা ভলটেয়ারের মতন ধ্বংসপ্রয়াসী নহেন। অধিকন্তু, 'পলাশীর' যুদ্ধে কবি কেবল 'সেরাজুদ্দৌল্লা বধ' লিখিতে অগ্রসর হয়েন নাই, কোন রূপ 'বধ' কিম্বা 'সংহার', লক্ষ্য করিয়া এই কবি কেবল 'আত্মনিষ্ট শিল্প কলার' আদর্শে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। পরাধীন দেশের কবি নবীন চন্দ্রের সতর্ক-রুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাস 'পলাশীর যুদ্ধের' প্রধান সৌন্দর্য্য, এই গ্রন্থের স্থল বিশেষের জন্য কবিকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। স্বাধীন-প্রকৃতি নবীনচন্দ্র এই জন্য নিজের সেবা বৃত্তিকে চিরকাল ধিক্কার দিয়া আসিয়াছেন, সময় সময় নিজের অবস্থানিয়ন্ত্রণায় নিদারুণ যাতনানুভব করিয়া গিয়াছেন।

তৎপর রঙ্গমতী, এই কাব্য কবির আত্মপ্রতিভার প্রতিকৃতি। জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমুগ্ধ কবি, প্রত্যক্ষ ভাবে, সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যস্থলে আপন বীণাপাণিকে স্থাপন করিয়া, যদৃচ্ছসঙ্গীতে আপন হৃদয়কে ছাড়িয়া দিয়াছেন। কোন বাধা নাই, অপর কেহ শুনিতেছে কিনা, বিচার করিতেছে কিনা, যেন সেই দিকে কবির কিছুমাত্র লক্ষ্য

নাই, আপন আনন্দ-দত্তে প্রবাহিনী আমাদের এই কর্ণফুলীর ন্যায়, সমস্ত ছন্দোবন্ধ, শাস্ত্র বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্বাধীনতার মধ্যেই কবির প্রকৃত অন্তরতত্ত্ব আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। আমি অন্যত্র দেখাইয়াছি, সেই গ্রন্থের নায়ক প্রকৃত প্রস্তাবে স্বয়ং নবীনচন্দ্র, বীরেন্দ্র প্রভৃতি বাহ্যিক উপলক্ষ্য মাত্র। সেক্সপীয়রের 'রোমিও জুলিয়েতের' ন্যায় এই গ্রন্থ কবির প্রথম যৌবনোল্লাসের—আত্মিক প্রতিকৃতি।

এই প্রসঙ্গে একটা বিষয় চিন্তা করা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই জাতীয় ভাবমুগ্ধ কবির পক্ষে, ছন্দোবন্ধ যেমন একদিকে নিয়ন্ত্রারূপে কার্য্য করে, অন্যদিকে তেমনি, কবির স্বেচ্ছাচার সীমাবদ্ধ করিয়া মহদুপকার সাধিত করে। মিলটন 'প্যারেডাইস্ লষ্ট' কাব্যের ভূমিকায় কাব্যের ছন্দোবন্দকে নিগৃহীত করিয়া একভাবে সমুচ্চ সাহিত্যের মহদুপকার সাধিত করিয়াছেন। মিলটনের প্রতিভা একদিকে যেমন সমুদ্রের ন্যায় বিপুল উচ্ছ্বাস ও সামর্থময়, অন্যদিকে, তেমনি, আপন প্রকৃতির সুপ্রতিষ্ঠ সংযমবশে নিয়ন্ত্রিত ও নিগৃহীত, মিলটনের পক্ষেই অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতা সুফলপ্রসূ হইতে পারিয়াছে। আমাদের মধুসূদনও সর্ব্বত্র এই স্বাধীনতার সুব্যবহার করিতে পারেন নাই। 'পলাশীর যুদ্ধের' ছন্দোবন্ধন উল্লঙ্ঘন করিয়া, নবীনচন্দ্র, পরবর্ত্তী কাব্যাদিতে, এক দিকে যেমন স্বাধীনতাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে, তেমনি, ছন্দের সালঙ্কার ধ্বনি-গৌরব ও সংযমনিষ্ঠাকে হারাইয়াছিলেন। এই দৃষ্টান্ত প্রত্যেক নবীন সাহিত্য সেবীর প্রণিধানের বিষয় হইয়া থাকিবে।

বঙ্গমতীতে এই পরাধীন জাতির কবির নিপীড়িত হৃদয় স্বাধীনতার লোকপাবনী মূর্ত্তির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কাঁদিয়াছে, স্বদেশের স্বজাতির বর্ত্তমান দুরবস্থা পারদর্শন করিয়া অশক্ত আকুলতায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছে। এই বঙ্গমতীর মধ্যেই রৈবতক কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের মূল উদ্দেশ্যের সূত্রপাত দৃষ্ট হয়। কবি অতঃপর দীর্ঘজীবন উহারই অনুধাবনে ব্যয়িত করিয়া ঐ কাব্যত্রয়ের বিপুল আয়তনের মধ্যে, সযত্নপ্রযত্নে, ঐ মহাসমস্যার পূরণেই চেষ্টিত হইয়া গিয়াছেন।

কবি-ধর্ম্মের মধ্যেই এই দেশের, এই বিশাল হিন্দু বৌদ্ধ-মোসলেম খ্রীষ্টান নানাধর্ম্মাবৃত ভারতবর্ষের ভাবিষ্য উদ্ধব-বীজ দর্শন করিয়াছিলেন। তাই কিরূপে এই বিভেদবিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যে "এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক ভগবান" সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, সমস্ত বিভেদের মধ্যেও ঐক্য স্থাপন করিতে পারা যায়, তাহার আদর্শ স্থাপনে কবি হৃদয় এত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। রৈবতক কুরুক্ষেত্র প্রভাস সেই উদ্দীপনার ফল, ভারতবর্ষের অতীত যুগ হইতে, সংস্কৃত সাহিত্যের গুহাগত ভাবধারা নব পরিচ্ছদে পুনরাবর্ত্তিত করিবার ইহাই হেতু, "উনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" রচিত হইবার ও ব্যাখ্যার কারন। চণ্ডী ও গীতার অনুবাদ, খ্রীষ্ট, অমিতাভ, চৈতন্য ও মহম্মদের অনুকল্পনা তাহারই অবান্তর ঘটনা মাত্র।

আমাদের সাহিত্যের অত্যন্ত দুর্ভাগ্য, যে কবি এই 'চৈতন্য' সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এই বঙ্গদেশের কবিগণের মধ্যে চৈতন্যের ভক্তি সমুচ্ছ্বাসিত হৃদয়ের উত্তাল তরঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্য ছিলেন, একমাত্র

নবীনচন্দ্র। নবীনচন্দ্র একদিকে যেমন ক্লিওপেট্রা ও জরৎকারুর চরিত্রকে অনুপম ভাবে বুঝিয়াছিলেন, অন্য দিকে, তেমনি, শৈশবে সন্ন্যাসী কর্তৃক শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াও, স্বীয় হৃদয় সাধর্ম্ম্যে বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন ও শ্রীচৈতন্যের চরিত্রকে বুঝিতেছিলেন। কুরুক্ষেত্র ও প্রভাসের শ্রীকৃষ্ণে গৌরাঙ্গেরই পূর্ব্বাভাষ পাইয়াছিলাম। চৈতন্য উহাই সংহত হইতেছিল। ইতিমধ্যেই মহাকালের আহ্বান আসিয়া পড়িয়াছে, কবি স্বদেশের হৃদয়ে অসম্পূর্ণ কর্ম্ম সন্তাপ রাখিয়াই মহাপ্রস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

এইরূপে স্বদেশানুরাগে ও বিশ্বজনীন প্রেমে, স্বদেশের ক্ষেত্রে, এই স্বপ্ন মুগ্ধ বিরাট কবি-হৃদয় আমরণ একনিষ্ঠ থাকিয়া আপন ভাবে মানব সেবায় ইহ জীবন পাত করিয়া গিয়াছেন। ইহাই তাঁহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম সাধনা। কাহারও মুখাপেক্ষা করেন নাই, সম্মিলনের আদর্শ সংস্থাপন করিতে যাইয়া, স্বসমাজের প্রবল ব্রাহ্মণ্য প্রভাবকে নিগৃহীত করিতেও ছাড়েন নাই। তিনি বঙ্গ সাহিত্যের প্রাচীন মহাভারতের মুক্তবায়ু, ও ভারত-সমুদ্রের কল কল্লোল প্রবাহিত করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সম্প্রদায় বিশেষের ক্ষুদ্র স্বার্থ বা অভিমান আহত হইতেছে কিনা, তাহার বিচার করিতে চাহেন নাই।

কোন প্রাচীন পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যে এক অদ্ভুত প্রণালীর সমালোচনার রেখা-চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। "কাব্যেষু মাঘঃ, কবিঃ কালিদাসঃ।" কাব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? না, মাঘের শিশুপাল বধ, আর কবি কে? না কালিদাস। কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা জিজ্ঞাস্য নহে; কারণ প্রশ্নকর্ত্তা অপর কাহাকেও কবি বলিয়াই জানেন না; বহু কবির অস্তিত্ব বিষয়ে কোন আশঙ্কাই হয় নাই। কবি কাহাকে বুঝ?—না, কালিদাস। কালিদাস উৎকৃষ্ট কাব্যকার না হইতে পারেন, তবু, তিনিই কবি। উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিয়াও যাহার নিকট কবির "সার্টিফিকেট" পাওয়া গেল না, এমন সমালোচকটী কে? ফলতঃ, কথাটীর বিস্তর সারবত্তা আছে। উৎকৃষ্ট কাব্য নানা কারণে হয়। কিছু শক্তি, বিস্তর শ্রম, ও 'মধ্য রাত্রের তেল খরচ', অভিধান ও অলঙ্কার শাস্ত্র, এত সমস্তের মিলনেই শিশুপাল বধের মত উৎকৃষ্ট (?) কাব্য রচিত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া, কবি। কবি, সংস্কৃত সাহিত্যে কেবল একজন।

এই ভাবে আলোচনা করিতে বসিলে বলিতে পারা যায়, পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট কাব্যের সংখ্যা অগণ্য হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত কাব্যের সংখ্যা 'হাতের কড়ায়' গণিয়া লওয়া যায়। আরও দেখা যাইবে, তাহাদের অনেকেই, হয়ত উৎকৃষ্ট কাব্য একটীও লিখিয়া যাইতে পারেন নাই, ঐ হিসাবে নবীনচন্দ্রের লেখা বিচার করিতে বসিলে, আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই এই ধারণা হইতে থাকে—এই একজন প্রকৃত কবি, জগতের কবি-গণনায় যাঁহার নাম বাদ পড়িবে না, তেমনই একজন কবি, তাহার কাব্য হয়ত, রসজ্ঞ পাঠকের মন সর্ব্বথা সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না; স্থানে স্থানে হয়ত 'আপশোষ' রাখিয়া যাইবে—কিন্তু তবু কবি? ইংলণ্ডের সেক্সপীয়র বা বায়রণ যেমন শত শত ভুল ভ্রান্তি সত্ত্বেও চিরকালের শরণ্য ও বরণ্যে কবি—এই জাতীয় একজন কবি। সাহিত্য-জগতে এমন কবি দুর্লভ—যাহার কবিত্ব শক্তি ঝড়ের মত,—কোন বাধা বিচার নাই,

ভাষার, ব্যাকরণের, ছন্দের, অলঙ্কারের মুখাপেক্ষা নাই, যাহার চাল চলনে কোনরূপ সংযম নিয়ম নিবৃত্তি নাই; ভিতরে বাহিরে কোনরূপ ভয় বিক্ষোভ নাই,—যে আপন শক্তিদম্ভে যথেষ্ট আস্ফালনে ছুটিয়াছে, এই ভারতবর্ষের প্রাচীন শিখর শিরোদেশ হইতে নিঃসৃত ধারার স্রোত ছুটিয়াছে—অথচ সিন্ধু লক্ষ্য, ভারত মহাসমুদ্রের দিকেই ছুটিয়াছে।

নবীনচন্দ্রের কবিতার রচনা প্রণালী পর্য্যালোচনা করিতে বসিলেও তাহাই বুঝিব। কোনরূপ নিয়ম শৃঙ্খলা, বিচার বিতর্ক নাই, সংশোধন পরিবর্তন গোপন নাই, প্রবাহের মত অবাধ বেগে ছুটিয়াছে। সময় সময় এক বৈঠকেই এক একটা 'সর্গ' উৎসারিত হইয়া অবস্থায় মুদ্রাযন্ত্রগত হইবার জন্য গিয়াছে। নবীনচন্দ্রের কোন লেখার কখন নকল-নবীশের আবশ্যক পড়ে নাই। নবীনচন্দ্রের চিন্তা ও রচনা সমগতিক ছিল। বীণার ঝঙ্কারের ন্যায়, তাঁহার ভাবাহত হৃদয়ের স্পন্দনগুলিই কবিতা রূপে প্রকটিত। তাঁহার হৃদয়-শোণিতের সাহায্যেই তাঁহার কাব্যাদি লিখিত হইয়াছে। আত্ম জীবনীর পিতৃ-বিয়োগাধ্যায়ের ও কুরুক্ষেত্র প্রভাসের স্থল বিশেষের, হস্তলিপি এক অপূর্ব্ব, পরম পবিত্র ও সযত্ন-রক্ষণীয় পদার্থ। নবীনচন্দ্রের হৃদয়োৎসারিত বড় বড় অশ্রুবিন্দুতে স্থানে স্থানে মসীলিপি ক্ষালিত হইয়া গিয়াছে!

নবীনচন্দ্রের জীবন আলোচনা করিয়াও তাহাই দেখিব, সম্পূর্ণ স্বাধীন—এমন কি, স্বেচ্ছাগতিক জীবন। শৈশব হইতেই উঁহার কোন অভিভাবক নাই। শৈশবে জননী অন্তবালে সরিয়া গিয়া, বালকটীকে সম্পূর্ণ রূপে, প্রকৃতির হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন; অতি স্নেহময় পিতাও স্বীয় হস্ত সঙ্কুচিত করিয়া, বালকের সমস্ত বন্ধন কাটিয়া দিয়া তাঁহাকে নির্ব্বিঘ্নে স্বীয় ইষ্টদেবতা ভোলানাথের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। বালক সমবয়সীর সমস্ত সৃষ্টি করিয়া, হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া গাইয়া, শিক্ষকদিগকে, পাড়াপ্রতিবেশীদিগকে, বিধিমতে উৎপীড়িত করিয়া, দম্ভে ও অহঙ্কারে উৎকণ্ঠ হইয়া দেশময় ছুটিয়া চলিয়াছে। তারপর, সাক্ষ্য ভূমি হইতে পিতার প্রস্থান—ক্ষণকালের জন্য সংসারের বিভীষিকা মূর্ত্তি প্রকাশ—তাহাতেই জাগরণ, প্রকৃত কবি নবীনচন্দ্রের জাগরণ। সেইদিন, দুঃখের দীক্ষায়, পবিত্র পিতৃভক্তির অশ্রুজলে, দীনহীনা চট্টলভূমির একপ্রান্তে যে কবি জাগিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের সাহিত্যকুঞ্জ সেই অকৃত্রিম স্বভাব-কবির প্রমত্ত সঙ্গীতেই এতদিন মুখরিত হইতেছিল, এবং আজ তাঁহারই সার্থক জীবনের 'বিজয়া' সমাহিত হইয়া গিয়াছে।

আমরা, তাঁহার স্বদেশীগণ, তাঁহার অনুরক্তগণ, তাঁহার কবিতার ভক্তগণ, আজ আমাদের হৃদয়-বেদনা কিরূপে প্রকাশ করিব? আমাদের হৃদয় কি প্রতি মুহূর্ত্তে বলিয়া দিতেছে না, এই দেশের জ্যোতিঃ চলিয়া গিয়াছে, আমাদের প্রিয়তম সুহৃদ্, আমাদের সাহিত্যের রসকৌমুদী-নির্ঝর নবীনচন্দ্র আর ইহজগতে নাই! যিনি আমাদের জন্মভূমিকে এত ভালবাসিতেন; জন্মভূমির কোন লোক সাহিত্য সেবা করিতেছে জানিলে, যাঁহার হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হইত, জন্মভূমি যাঁহার নিকট সর্ব্বতোভাবে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' ছিল; যিনি যত্র-তত্র সগর্ব্বে তাঁহার জন্মভূমির গৌরব কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন; এই দেশের শৈল নদী সাগরকান্তারের মাহাত্ম্য-প্রতিভা যাঁহার

কবিতায় সর্ব্বত্র শতমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, জন্মভূমির যে বাৎসল্য মুগ্ধ শিশু, প্রতি বৎসর, দূরপ্রবাস হইতে মাতৃবক্ষে ফিরিয়া আসিয়া স্নেহগদগদ কণ্ঠে অনুপম ভাষায় ডাকিতেন :—

মা! মা! মা! কত কাল পরে
ডাকিলাম ওমা পরাণ ভরে।
শৈল কিরীটিনী,
সাগর-কুন্তলা
মাকংমালিনী—হেরিলাম তোরে।

জন্মভূমির সেই প্রিয়তম পুত্র যখন নিজের জীবনের শেষ জানিয়া, দূরদেশ হইতে জন্মভূমির বক্ষে, পিতৃশ্মশানের পার্শ্বে বিশ্রামের জন্য ফিরিয়া আসিলেন, ও অবশেষে যোগাবেশে জন্মভূমির বক্ষে সংসার-সন্তপ্ত বক্ষঃ রাখিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন, তখন কি এই বঙ্গ প্রাচীনা অবলাভূমি, ইহার শৈল-নদীকান্তার সমুদ্র সহ পরম শোকাবেগে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে নাই? যে কবি যৌবনের প্রারম্ভে গাইয়াছিলেন :—

একদা প্রভাতে সথে, মেলিয়া নয়ন
সিন্ধু প্রান্তে সুসজ্জিত জলদ মালায়,
দেখিলাম জন্মভূমি প্রতিমূর্ত্তি প্রায়।
তেমতি শ্যামল শোভা মণ্ডিত শেখর,
স্থানে স্থানে সমুন্নত অতীব সুন্দর
রহিয়াছে স্থির ভাবে প্রবাহ খেলিয়া,
উর্ম্মির উপরে যেন উর্ম্মি সাজাইয়া।
নিম্নস্তরে সাগরোর্ম্মি সুনীল বরণ
উচ্চস্তরে শেখরোর্ম্মি শ্যাম সুদর্শন।

জন্মভূমির সেই হৃদয়ঙ্গম সন্তান আজ কোথায়? আজ তাঁহার অভাবে এই ভূমি কি আপনার বিপুল সঞ্চিত ভাবিনী শক্তি ও মমতা বিধায়িনী স্নেহ করুণা লইয়া শূন্য প্রতীক্ষায় নিশ্বাস ফেলিতেছেন না? এই ভূমি চিরকাল কবিভূমি, সাধু, যোগী, ফকির, দরবেশের ভূমি। এই ভূমিই অতীত কালে আপন মহনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও জ্ঞান গরিমায় 'রম্যভূমি' ও 'পণ্ডিত বিহার' নামে খ্যাত হইয়াছিল ও ভারতবর্ষের গৌরবস্বরূপ ব্রাহ্মণ্যবিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্মকে আপন নিভৃত শৈলকন্দরে আশ্রয়দানে রক্ষা করিয়াছিল। এই ভূমিই চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে,বাঙ্গালা জাতির জাগরণ যুগে, নবদ্বীপ চন্দ্রের বিশ্ববিজয়ী ভক্তি-সংকীর্ত্তনে, আপনার শান্ত নিভৃত গুহাসদন হইতে স্বভাব সুকণ্ঠ মুকুন্দ ও ভক্ত পুণ্ডরীককে প্রেরণ করিয়াছিল, এই ভূমিই বঙ্গ-সাহিত্যের নিদানস্বরূপে রামায়ণ ও মহাভারতের পাবনী ভাবধারা ভাষান্তরিত করিয়া আপন দরাকদার রক্ষা করিয়াছিল; ও শত শত কবির হৃদয় রত্নাকর হইতে সুবৃহৎ 'জাগরণ' ও 'মনসার পুঁথি' সঞ্চিত করিয়াছিল, এই ভূমিই মোসলেমযুগে সংস্কৃত পারশী উর্দ্দু ও বাঙ্গালা ভাষার ও ভাবের মহামিলন সংঘটনে, বাঙ্গালার সাহিত্য মাঞ্চ কবিগুণাকর ভারতচন্দ্রের সহিত একাসনে বসিবার জন্য, কবিবর আলাওলকে সমুদ্ধাপ্ত করিয়াছিল এবং এই ভূমিই পরিশেষে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যসভ্যতার সম্মিলন স্থলে, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সাহিত্য ধর্ম্ম, রাজনীতি ও সমাজনীতির সঙ্কটযুগে, প্রাচীন মহাভারতের চিরন্তন আদর্শকে নব-পরিচ্ছদে পুনঃপ্রচার করিবার চেষ্টা কল্পে, আপনার শৈলনদী সমুদ্রের প্রতিভায় সমুদ্ধাপ্ত করিয়া নবীনচন্দ্রকে বঙ্গদেশের সাহিত্য-রঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিল। মায়ের এই শেষ আশা ও প্রযত্ন সফল হইয়াছে কিনা, বা কি পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহার বিচার বারবার ক্ষমতা বা কর্ত্তব্য আমাদের নহে।

আজ আমরা জননীর প্রিয়পুত্র ও প্রিয়তম আত্মীয়কে শ্মশানানলে ভস্মীভূত করিয়া শোকভারাক্রান্ত-হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন।

নব্য জাপানের জীবনসঞ্চার।

"All Europe wonders not a little
At the new Empire that has arisen"
Wellheim

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুলাই, যে দিন আমেরিকার প্রতিনিধিরূপে, অবাধ বাণিজ্যের প্রীতিলিপি হস্তে, অসীম সাহসী কমোডোর পেরী, তাঁহার ধূমোদ্গীরিত রণতরীশ্রেণী সঙ্গে, জাপানের শৈলশোভাময় 'এড্ডো' উপসাগরের কূলে 'উরগা' পল্লীর তীরে, সমুদ্রবক্ষে, দাঁড়াইয়াছিলেন, সে দিন নব্যজাপানের জীবন-ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় দিন। যথার্থই জাপানের পক্ষে সে দিন বিধাতা-প্রেরিত কল্যাণময় দিন। যেন শুভাকাঙ্ক্ষিণী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর মূর্ত্তিমান আভাসরূপে, পেরীর পোত-বহর, বিনিদ্র জাপানবাসীকে জগতের জাগ্রত জাতিদের সহিত জাগিতে আহ্বান করিল।

পেরীর কল্যাণে সেই প্রথম প্রতীচ্যের সহিত সুদূর প্রাচ্যের সম্মিলন। জাপানে বিদেশী-বিদ্বেষ যখন বদ্ধমূল, 'শ্বেত শয়তান'-দের ছলনা হইতে আত্মরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে জাপান যখন কৃতনিশ্চয়, সাগরবেষ্টিত নিরাপদ দ্বীপমালামধ্যে তাহার নিজস্ব চারু-শিল্প, তাহার নিজস্ব চেরীপুষ্পোদ্যানের সুকুমার সাহিত্য, তাহার পুণ্যস্মৃতিময় 'দৈবৎসু,' (বুদ্ধ) তাহার উদ্দীপনাপূর্ণ 'সামুরায়' বীর-গাথা, তাহার অফুরন্ত স্বর্ণখনি ও সোণার শস্য, তাহার কবি ও প্রেমিক প্রেমিকাদের লীলানিকেতন নিত্য নব সৌন্দর্য্যময় শুভ্র-কিরীটধারী 'ফুজিইয়ামা,'—এই সব তাহার জীবন ও আনন্দের পক্ষে যখন যথেষ্ট মনে করিতেছিল, 'শ্বেতশয়তানদের নিকট কিছু শিক্ষা করিবার আবশ্যক নাই,' 'শান্তিময় জাপানে বিদেশীর প্রবেশাধিকার দিলে আর রক্ষা নাই,' এই ভাবের প্রবলতার মধ্যে যখন ইয়োরোপের অন্যান্য শক্তিপুঞ্জ জাপানে বাণিজ্যাধিকার লাভের আশায় যথাসাধ্য নিষ্ফল চেষ্টা করিবার পর অবশেষে নিরাশচিত্তে ঘরে ফিরিতেছিল, এমন সময়ে, সহসা যেন যাদুকর ঐন্দ্রজালিকের ন্যায়, পেরী সস্মিতমুখে সাগর বক্ষ হইতে জাপানকে অভিবাদন করিলেন, তাহার রুদ্ধদ্বার উন্মোচন করিতে উপদেশ করিলেন। নূতন মহাদেশের পত্রবাহক বলিলেন,—"মানুষে মানুষে যে প্রীতিসম্মিলনের স্বাভাবিক স্পৃহা, জাতিতে জাতিতে যে পরস্পর আদান প্রদানের আবশ্যক, তাহারি জন্য আমরা তোমার দ্বারে উপস্থিত।" সঙ্কোচে, সংশয়ে, লজ্জায় জাপান আমেরিকার নিকট আবরণ উন্মোচন করিল। অনেক কল্পনা জল্পনা, অনেক বিঘ্ন বিরোধ, অনেক মতান্তর মনান্তরের পর, পেরীর আগমনের প্রায় নয় মাস পরে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ্চ, উভয় রাজ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ-সন্ধিপত্র লিখিত হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে হইলে, সেই দিন নব্যজাপানের জীবন-সঞ্চার হইল।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ মার্চ্চ জীবনসঞ্চার দিন, আর সেই ঘটনার চল্লিশ বৎসর পরে, ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর,মধ্যাহ্ন হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত 'তাই ইয়াং' দ্বীপ ও 'ইয়ালু' নদীর প্রবেশ পথ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ প্রদেশে, জাপানের কামান শ্রেণীর করাল অগ্নি-গোলকরাশির ভীম ভৈরব নিনাদে, কোরিয় উপসাগরের দিক্‌দিগন্ত প্রতিধ্বনিতে বিস্মিত স্তম্ভিত জগতের নিকট নব্যজাপানের জন্ম-মহোৎসব সংবাদ প্রচারিত হইল।

এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব যুগান্তর ঘটনা উল্লেখে তাই কোন প্রতীচ্য প্রাচীন রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন,—আজ ইয়ালু জলযুদ্ধের গুরুত্ব সমগ্র পৃথিবীতে স্বীকৃত হইল। সহসা যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় ইহা পূর্ব্ব এশিয়ার এক সম্পূর্ণ অভিনব অবস্থা উন্মুক্ত করিয়া দিল। সেই বিশাল চীন-সাম্রাজ্য, যাহার বৃহত্ত্বকে পাশ্চাত্য জাতি চিরকাল মহত্ত্বরূপে ভয় বুঝিতেছিল, অসীম অন্তর্নিহিত কত শক্তির ভাণ্ডাররূপে যে দেশ গণনীয় ছিল, তাহার ভ্রষ্টতার এক চলৎশক্তিহীন বিপুল স্তূপরূপে অসহায় অবস্থায় জড়তা প্রাপ্ত হইতেছে, দেখা গেল। আর জাপান—এক অভিনব আলোক উজ্জ্বল্যে প্রতিভাত, এক আদর্শ রাষ্ট্রীয় শক্তি-রূপে দণ্ডায়মান, সে আর অন্যদীয় নেতৃত্বের করধৃত বজ্জুদ্বারা পরিচালিত নয়, পরন্তু পূর্ব্বে এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম কর্ম্মকর্তৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ কৃতনিশ্চয় এবং সম্পূর্ণ যোগ্য; এমন এক শক্তি, যাহার কথা ভবিষ্যতে নবসূর্য্যের উদয়দ্রষ্টা প্রতিবাসী প্রাচ্য দেশ সমূহের সর্ব্ব প্রকার রাজনৈতিক সম্মিলন—সাফল্য উপলক্ষে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিতে হইবে। পাশ্চাত্য রাজনীতি-বেত্তাদের দৃঢ়বদ্ধমূল পূর্ব্ব সংস্কার সমূলে উৎপাটিত হইল, জনসাধারণের চিরপোষিত ভ্রান্ত বিশ্বাস সজোরে আঘাত পাইল এবং যখন ইয়ালুর যুদ্ধধূমাবলী চীন সমুদ্র-তরঙ্গের উপরে উপরে দূর দূরান্তরে প্রবাহিত হইল, তখন পাশ্চাত্য পৃথিবীর বিস্মিত জনসাধারণ দেখিতে পাইল, প্রাচীন প্রাচ্যভূমি সেই উদ্বেলিত সাগর জলে চীন সাম্রাজ্যের স্পর্দ্ধিত জলযুদ্ধশক্তির সহিত ডুবিতেছে, তাহার পরিবর্ত্তে এশিয়ার সুদূর পূর্ব্ব সীমান্ত হইতে সুদৃঢ়ভঙ্গীর সঙ্গে নব্য প্রাচ্যভূমি দৃষ্টিপথবর্ত্তী হইতেছে। কয়েকটী মাসের মধ্যে সেই 'চঞ্চল প্রকৃতি, পরিহাসজনক অনুকরণকারী ক্ষুদ্র জাপান' একটী জলযুদ্ধ শক্তিরূপে পরিণত এবং যেন বর্ত্তমান কালের সেই মহাকায় রাক্ষস-বধ কর্ত্তা। জাপানের রাজনীতিবেত্তা ও যোদ্ধাগণ, তাঁহাদের স্বদেশকে জগতের নিকট একটী রাষ্ট্রীয় শক্তিরূপে প্রমাণ করিতে যে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারই সম্পূর্ণ সাফল্য দৃষ্টে, তাহাদের অধর প্রান্তে কিঞ্চিৎ সংযত হাস্যচিহ্ন দেখা গেল। রাষ্ট্রীয় শান্তিসুখ-সাফল্যের সহিত সংগ্রামের যে কি নিকট প্রয়োজন সম্বন্ধ, তাহারা পাশ্চাত্য জাতিদের ধরণ, ধারণ আকৃতি প্রকৃতি হইতে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। যে সব রাজ্য কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানকে অতি যৎসামান্য শিষ্টাচার প্রদর্শন করিত, এখন আবার তাহার সঙ্গে মিত্রতা-সম্বন্ধ পাতাইবার গুরুতর বিষয়ে তাঁহারা বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আরও কোন কোন প্রধান শক্তি অন্যান্য শক্তির ন্যায় জাপানকে মহা সম্মান প্রদর্শন করিল সত্য, কিন্তু তাহাকে এখন হইতে বিপজ্জনক প্রতিযোগী বোধে দমন করিবার অভিপ্রায় এক অমানুষিক, অন্যায়, স্বার্থাভিপ্রায়-দুষ্ট একতার

আবদ্ধ হইল। কি সুহৃদ্, কি শত্রু, সকলেই তখন সেই নবাগত পরিবর্ত্তিত অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলেন, কারণ মনোবুদ্ধির অগোচরে এক নব্য প্রাচ্য শক্তির অভ্যুদয় দেখা যাইতেছে। *

সুদূর প্রাচ্যের এই অভাবনীয় ঘটনা সম্পর্কে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মানসিক চঞ্চলতা এতদূর বৃদ্ধি পায়; যাহা অবশেষে জনসাধারণের মধ্যে 'পীতাতঙ্ক' নাম পরিগ্রহ করে। অনেক রহস্যময় উপভোগ্য ইতিহাস এই ঘটনার সহিত জড়িত আছে। এই পীতাতঙ্ককে মূর্ত্তিমান করিবার রাজনৈতিক অভিপ্রায়ে বিগত ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের জার্ম্মান্ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ম স্বহস্তে একটী রূপক চিত্রের আভাস অঙ্কিত করেন, তাহাই সচিত্রিত করার জন্য অধ্যাপক ন্যাক্ফাসের প্রতি (Professor Knackfuss) ভারার্পিত হয়। সযত্নে রাজাদেশ পালিত হইলে মূর্ত্তিমান 'পীতাতঙ্ক' রাজকরে অর্পিত হইল। সম্রাট তাঁহার সেই স্বকপোল-কল্পিত চিত্রখানি অবিলম্বে তাঁহার পরম বন্ধু 'জার' মহোদয়কে উপহার দিলেন। রুষ সম্রাট এই উপদেশপূর্ণ চিত্রিত চিত্রের নিগূঢ় অর্থ বিলক্ষণ বুঝিলেন এবং কৃতজ্ঞ গদ্‌গদ চিত্তে শুভাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ্‌কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইলেন। তারপর, পাশ্চাত্য জাতির প্রেমে মুগ্ধ, নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার অবতার তুল্য জার্ম্মানীর নব্য ভব্য দ্বিতীয় উইলিয়াম্ চিত্রের নিম্নে স্বহস্তে নিজ নাম স্বাক্ষর পূর্ব্বক জার্ম্মান্ ভাষায় লিখিলেন,—"হে ইওরোপীয় জাতি সকল। তোমাদের গৃহ ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য তোমরা সকলে সম্মিলিত হও।"—ফরাসী ভাষায় অনূদিত হইল, ইংরেজিতে অনূদিত হইল,—"Nation of Europe! Join in defence of faith and your home." এই সদুপদেষ্টা যে তিনিই, জনসাধারণের তাহার নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করিবার একান্ত আগ্রহে, সেই মহতী নীতি কথার নিম্নে স্পষ্টাক্ষরে "Wilhelm, J.R." স্বাক্ষরিত হইল। খ্রীষ্টশিষ্য এই জার্ম্মান্ সম্রাটটীর নিত্য নানা ভাব প্রদর্শিনী কল্পনার কথা ইহিপূর্ব্বেই

* The importance of Yalu Sea fight was quickly appreciated throughout the world. It revealed suddenly as if by magic the existence of an entirely new hitherto barely suspected condition of affairs in Eastern Asia. The huge Chinese Empire, which western world ever ready to mistake bigness for greatness had credited with boundless stores of latent strength was shown to be an inert mass of corruption, feebly drifting towards disintegration, whilst Japan stood revealed in the full glare of a new light as a nation no longer in leading-strings, but capable of being and fully determined to be a dominant factor in Eastern Asia—a power to be reckoned with in future, in any political combination affecting the countries which face the rising sun. Preconceived notions, deeply implanted in the minds of western statesmen, were uprooted, popular misconceptions received a rude shock, and as the battle-smoke drifted away over the waves of the China sea, the astonished eyes of accidentals beheld the old far east sinking in the flood, along with the boasted naval power of China, and in its stead rising steadily from the "edge of Asia" the new far east came into view. In a few months, "frivolous, superficial, grotesquely imitative, little Japan" had become a naval power, and "the modern Jack the giant killer." The statesmen and the warriors of Japan smiled grimly as they noted the complete success of their efforts to prove Japan a nation. They had rightly gauged the relative value of the triumphs of peace and of those of war in the estimation of the great powers of the west. Governments that had, in the past, treated Japan with scant courtesy now seriously considered the question of an alliance with her. Other great powers paid her the almost equally great compliment of looking upon her as a dangerous rival and formed a monstrous unnatural coalition for the purpose of coercing her. Friends and foes alike had begun to grasp the changed situation, the new far East was born."

"New Japan", Diosy

দেশ বিদেশে প্রচারিত ছিল, এবার এই "পীতাতঙ্ক" তাঁহার অনন্যসাধারণ খ্রীষ্টান-প্রেমের কাহিনীও দিগ্‌দিগন্তে প্রচার করিল। এহেন রাজকপোল-কল্পিত চিত্র খানি আমাদের প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। রূপক চিত্রে ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের মূর্ত্তিময়ী শক্তিরূপিণী নগ্নকরবাল ধারিণী (Female Personifications of the Principal nations of Europe) নারীমূর্ত্তি সকলের উজ্জ্বল নয়নে অনন্যনারী-সুলভ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিচ্ছুরিত, সাভিলাষ দৃষ্টি—এ সকলই পীতাতঙ্ক উপলক্ষে বীরত্ববিকাশ। তাঁদের ললিত-মধুর যৌবনের চল ঢল সৌকুমার্য্যে কি অসাধারণ চিত্রাঙ্কণী প্রতিভাই প্রকাশিত। আমি নিম্নে তাহার যথাসাধ্য বর্ণনা করিতেছি, প্রিয় পাঠক পাঠিকা তদ্বারা মানস-নয়নে যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ করিবেন।

বৃক্ষলতা সম্পর্কশূন্য কৃষ্ণবর্ণ উচ্চ শৈল-শিখরের পাদপ্রান্ত হইতে খুব সম্ভবতঃ বাঁকা-নদী রেখা যেন একটী রজত রেখার মতন বক্রগতিতে ক্রমে দূর হইতে দূরান্তরে দিগন্তে মিলিত। শুভ্র নদী-সৈকতে প্রাসাদ-সৌধ-সমাচ্ছন্ন উত্তর ইয়োরোপীয় এক নগর শোভা পাইতেছে। সেই উচ্চ শৈল শিখরোপরি দেবদূতরূপে (Archangel) জার্ম্মাণীর হৃষ্টপুষ্ট নব্য পুরুষপ্রবর জ্বালাময় নয়নে উন্মুক্ত উদ্যত লেলিহান তরবার হস্তে দণ্ডায়-মান। য়ুরোপীয় প্রত্যেক দেশের এক একটী রঙ্গিণী রণসঙ্গিণীরূপে তাঁহার পার্শ্বে সমবেত। তিনি সুদৃঢ় দণ্ডায়মান দেহে সেই দূরাগত পীতাতঙ্কের দিকে তাঁহার বামহস্তের অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছেন। তাঁহার উন্নত, বিশাল, সুপুষ্ট পক্ষদ্বয় পৃষ্ঠোপরি প্রসারিত। রমণী মূর্ত্তি কয়েকটীর দেহভঙ্গী, গঠন-সৌকুমার্য্য, মুখশ্রী, দৃষ্টি, পরিচ্ছদ-পরিপাট্য ইয়োরোপীয় বিভিন্ন দেশের বিচিত্র রুচির অনুরূপ পরিস্ফুট। জার্ম্মাণিয়া দীর্ঘাবয়ব অথচ পরিপুষ্টদেহা, পরিপূর্ণ মুখশ্রী, কৌতূহলাক্রান্তা ও অভিলাষময়ী, তাঁহার সুপুষ্ট সমুন্নত বক্ষ সযত্ন-বিন্যস্ত বস্ত্রে আবৃত, শুধু শুভ্র সুগোল বাহুদ্বয় সম্পূর্ণ অনাবৃত। দক্ষিণ করে অত্যুজ্জ্বল, তীক্ষ্ণধার-উদ্যত তরবারী, বামকরে দৃঢমুষ্টিবদ্ধ ঢাল, গর্ব্বিত, দীপ্তনয়নে তিনি পীতাতঙ্ক লক্ষ্য করিতেছেন। তাঁহার আজানুস্পর্শী সূক্ষ্ম লৌহবর্ম্ম দোদুল্যমান, কটিতট প্রশস্ত কটিবন্ধে বেষ্টিত, উন্নত ললাটের উপর হীরক শিরাস্ত্রাণ, তদুপরি প্রসারিত মুক্তপক্ষ ঈগলপক্ষী।

পার্শ্বেই ফ্রান্স—দুলালী, বিলাসিনী, চিরচঞ্চলতাময়ী ফ্রান্স। তন্বী সুকুমারীর ললিত লাবণ্যময়ী, ভঙ্গীময়ী দেহলতা। প্রতিভা উজ্জ্বল নীল নয়ন-অপাঙ্গে তীক্ষ্ণবুদ্ধি বিচ্ছুরিত। নব প্রস্ফুটিত শুভ্র কমল যুগলের মত বুকের উপর সূক্ষ্ম বসনোন্নীত যৌবন-চিহ্ন সুস্পষ্ট। রক্তবর্ণ পাৎলা অধর প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কৌতুক-কৌতূহলের বৃথা সংযম আয়াস-সূচক মৃদু মধুর হাসি। শীর্ণ সুন্দর নিটোল ক্ষুদ্র বাহুদ্বয় অনাবৃত; দক্ষিণ করে গগনস্পর্শী উজ্জ্বল- ভল্লাস্ত্রযষ্ঠি, উত্তোলিত ভঙ্গীমাময় বামহস্তের করপল্লবে যেন রৌদ্রা-লোক হইতে নয়নাচ্ছাদনে একাগ্রনয়নে নদী পারের পীতাতঙ্ক প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার তিলফুল নাসিকা, স্বর্ণকুন্তলরাশি খোঁপাবাঁধা, অতিক্ষীণ কটিতটে রেশম-বিনির্ম্মিত কোমরবন্দ বেষ্টিত। মসলিনসূক্ষ্ম বস্ত্রাচ্ছাদন হইতে নাভিমূল পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ হইতেছে।

তার পরের সারিতেই জার্ম্মাণিয়ার

স্কন্ধদেশে রুশিয়া-সুন্দরী তাঁহার হীরকচূড়ী-পরা তুষারশুভ্র নগ্নবাহু বেষ্টন পূর্ব্বক যেন সখী জার্ম্মানিয়ার প্রেমে গদ্গদভাবে দণ্ডায়মান আছেন। বামকরে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ কশাক ভল্লাস্ত্র পীতাতঙ্কের দিকে উদ্যত। বক্ষ হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত জার্ম্মানিয়ারই মতন লৌহবর্ম্মে আবৃত, কিন্তু তার কারিগরি জার্ম্মানীর ন্যায় সূক্ষ্ম হয় নাই, মোটা বয়নের লৌহবর্ম্ম, রুশিয়ার স্বদেশজাত শিল্প নিশ্চয় অনুমান হয়। আলুলায়িত কেশরাশিতে পৃষ্ঠদেশ হইতে নিতম্ব পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন। ললাটের উপর হীরকতারা জ্বল জ্বল করিতেছে। তিনি সুন্দরী, তাঁহার তুষার-শুভ্র বর্ণ, আয়ত কৃষ্ণনীলাভ নয়ন, কিন্তু মুখশ্রীতে এমন কিছু বিশেষত্ব নাই।

তার পরে অষ্ট্রিয়ার নারীমূর্ত্তি। তিনি কোন অস্ত্রধারণ করেন নাই। কিন্তু অস্ত্রধারিণী সখীগণের সঙ্গিনীরূপে তাঁহাদের পার্শ্বে বিরাজ করিতেছেন। পীতাতঙ্কিতা সখীদের প্রেমমুগ্ধা অষ্ট্রিয়া তাঁহার পশ্চাৎদিকে দণ্ডায়মানা, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া ব্রিটানিয়া সুন্দরীর শুভ্র সুগোল বাহুখানি আদরে ধারণ পূর্ব্বক সনির্ব্বন্ধ আগ্রহে তাঁহার সখীদের দলভুক্ত হইবার জন্য আকর্ষণ করিতেছেন। তথাপি ব্রিটানিয়া যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া। ব্রিটানিয়ার সরল, সুন্দর, অতি সুন্দর, বালিকাসুলভ মুখশ্রীতে যেন চিন্তাশীলতা মাখানো। অষ্ট্রিয়াসখীর অনুরোধ-উত্তেজনাতেও সে অপূর্ব্ব মুখশ্রীতে চঞ্চলতার কোন লক্ষণ নাই। ইহার অবশ্য কোন নিগূঢ় কারণ আছে। ব্রিটানিয়ার পাশে শিবাবরণবিহীনা, মুক্তকুন্তলা, আয়তকৃষ্ণনয়না, তন্বী-সুন্দরী ইতালা। সকলের শেষে, প্রায় প্রচ্ছন্ন দেহে দুই নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান, সম্ভবতঃ একটী স্পেন, আর একটী পর্টুগাল। নবীনা আমেরিকা দলে মেশেন নাই।

আর পীতাতঙ্ক? সে এক উদ্ভাসিত অগ্নিগোলকাসনে অধিষ্ঠিত দেহে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে।

শ্রীকিশোরীমোহন রায়।

সাঙ্কেতিক।

যে যুগে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "ভয়ে ভয়ে যাই, ভয়ে ভয়ে চাই"—সে যুগ কবে অতীতে বিলীন হইয়া গিয়াছে,—কিন্তু সে যুগে কি আজকালকার মত ভয় ও বিভীষিকার রাজত্ব ছিল? তখন "যাইতে" বা "চাহিতে" হয় ত ভয় ছিল; এখন "শুইতে," "বসিতে" "আহারে" "আলাপনে"ও ভয় জাগিয়া উঠিয়াছে। সদা ভয়—কখন কাহার ভাগ্যে কি হয়! লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র, এইরূপ ভয়ে দেশ ছাড়িয়া বিলাতে গেলেন, কত কত রূপে কত কত নিরপরাধী ব্যক্তি নির্ব্বাসিত, নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ হইলেন! এরূপ দুর্দ্দিন এদেশে আর কখনও সমুপস্থিত হয় নাই!

ভয়ে?—ভয়ে নয় ত কি? ঘোষিত হইয়াছে, স্বদেশীর ভয়ে লাজপত রায় দেশত্যাগী, বিদেশীর ভয়ে বিপিনচন্দ্র দেশত্যাগী, এবং অদম্য সুরেন্দ্রনাথ মৃতবৎ নিশ্চল! বুদ্ধি বা জ্ঞান, প্রতিভা বা চৈতন্য, সম্পদ বা ঐশ্চর্য্য—কিসে রাসবিহারী পার্শী মেটা অপেক্ষা হীন?—কিন্তু তিনিও যে, সে দিন,

মান্দ্রাজে, বাঙ্গালীর নেতৃত্বকে, হাসিতে হাসিতে, হেলায়, খেলায়, মেটার পদে উৎসর্গ করিয়া আসিলেন, সে কিসের জন্য ?—আমরা বলি, সেও ভয়ে। ভাই, তুমি বিরক্ত হইও না, কোন "ভয়" না থাকিলে, আজ রাসবিহারী, সুরেন্দ্রনাথ ঐরূপে লোক হাসাইতেন না, আশুতোষ আজ স্কুল কলেজের হন্তারূপে দেদীপ্যমান হইয়া দেশবৈরী সাজ পরিতেন না। আমরা চিরদিন দর্প করিয়া বলিতাম, প্রতিভা স্বাধীনতার প্রসূতি, কিন্তু আজ যে "প্রতিভা" পরাধীনতার ভ্রুকুটীতে মলিন ও নিষ্প্রভ, ইহা কেবল ভয়ে! আশুতোষের প্রতিভা, ইংরাজ-দর্প ভয়ে পরিম্লান, ঘোষ-বানর্জির প্রতিভা শুধু মেটার দৌরাত্ম্যে নয়, ঐভয়েই আজ জ্যোতিহীন। এদেশে কেবলই জাগিয়া উঠিতেছে—নির্ম্মম, কঠোর, মসী-ম্লান বিভীষিকা!! হায় রে দুর্দ্দিন!!!

গবর্ণমেণ্ট ভয় দেখাইবার জন্য অনেক কাগজ তুলিয়া দিয়াছেন, অনেক প্রেস বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন, অনেক লোককে কারারুদ্ধ ও নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। দুর্দান্ত যাঁহার প্রতাপ, তাঁহার অসাধ্য কি? যাঁহারা, এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা ভীত কি না, আমরা জানি না। অথচ, সর্ব্বদাই শুনিতেছি, লোক হাসিতে হাসিতে দণ্ড সহ্য করিতেছে। তবে ভীত কে? সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট আর কখানি কাগজ তুলিয়া দিয়াছেন? এদেশের কাপুরুষ এবং পা-চাটার দল, এ কাগজ, সে কাগজ, কত কাগজ ছাড়িতেছেন;—অনুসন্ধান কর, জানিতে পারিবে। সম্পাদকদের সকল ঘরেই হাহাকার,—সহানুভূতি বা সাহায্য;—দিন দিনই দুর্ঘট হইয়া উঠিতেছে। ইতালীতে ম্যাট্‌সিনির "নব্য-ইতালী" পত্রিকার মমতায়, সে কালে, সে দেশের লোকেরা অম্লানবদনে প্রাণ দিয়াছিল, কিন্তু এ দেশে—প্রাণত্যাগ ত দূরের কথা,—একটু খাতির বা সম্মান, একটু স্বার্থ বা খেতাব, প্রতিপত্তি বা অধিকার বিচ্যুতির ভয়েই সকলে অস্থির—এ দিক, সে দিক, চতুর্দ্দিক হইতে পত্র পৌঁছিতেছে—"আর কাগজ চাই না!" হায় যে বিভীষিকা!

এরূপ কেন হইল? দোষ আমাদেরই। সত্য কথা বলিতে গেলে, এ কথা না বলিয়া থাকাও কঠিন যে, এদেশে, মধ্যপন্থী বা চরমপন্থী রূপী দুই দল নাই। পরাধীনতার রাজ্যে আবার দল, বেদল কি? বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্ন কথায় এই দুটী দলের অস্তিত্ব-প্রচার আমরাই করিয়াছি। "যাহা নাই," "আছে আছে" বলিতে বলিতে তাহারই অস্তিত্ব প্রতীত হইয়াছে। এদেশে এনার্কিষ্ট দল আছে, কে বলিল? দুই দশ জন অবাধ্য স্বেচ্ছাচারী বালক, খেলিতে খেলিতে, কি অন্যায় কার্য্য করিয়াছিল, তাহাকে গবর্ণমেণ্ট যদি বাতাস দিয়া না বাড়াইতেন, তবে কবে সে খেলা থামিয়া যাইত। গবর্ণমেণ্ট কেন বাড়াইলেন? এদেশের বিভীষণবর্গ গবর্ণমেণ্টের কাণে কাণে কি কি গুপ্ত কথা যেন বলিয়া দিয়া উস্কাইয়া দিলেন; আর রাখে কে? অবশ্য যদি বিচক্ষণ কর্ম্মদক্ষ লোক থাকিত, তবে বিভীষণদের কথা গবর্ণমেণ্টের কাণে ধরিত না, উড়াইবার কথা উড়িয়াই যাইত। বুদ্ধির অভাবে, গবর্ণমেণ্ট, কি-যেন-কি-একটা ভয়ের আতঙ্ক গণনা করিলেন, তাই মাতিলেন, খেপিলেন, যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাই করিতে লাগিলেন। হায়, মহামতি মেকার্ট সাহেব যদি আর দুই

বৎসর পূর্ব্বে এদেশের ছোটলাট হইতেন,তবে বুঝিবা, এরূপ দুর্দ্দৈব হইত না! কিন্তু বুঝিবা বিধাতার সে ইচ্ছা ছিল না; তাই "রজ্জুতে" গবর্ণমেণ্ট সর্পভ্রম করিলেন এবং যাহা অকর্ত্তব্য, তাহাই অবাধে করিতে লাগিলেন। আমরাও নানা রূপে সামান্যকে অসামান্য বলিয়া বুঝাইতে লাগিলাম। ফল কি দাঁড়াইল?—গবর্ণমেণ্ট একটা নিয়ম ভয়ের রাজ্যকে জাগাইয়া তুলিলেন। ফল কি দাঁড়াইল?—খেলিবার অজুহাতে বালকেরা যাহা করিতেছিল, তাহা হইতে জাগিয়া উঠিল যেন একটা প্রকট নবশক্তি! এখন,যাহা ঘটিতেছে এবং যাহা ঘটিবে,তাহার মূলে কেবল বিধাতারই হাত দেখিতেছি। নব-জাগরণের নব-যুগ, ভয়-বিভীষিকার মধ্য হইতে, দেখিতে দেখিতে, এইরূপে, জাগিয়া উঠিল।

যতদিন মোহের আবরণ থাকে, ততদিন মানুষ, ভালমন্দ, বুঝিতে পারে না। মোহাচ্ছন্নতার জন্যই, স্বদেশীরা, বাঙ্গালী শ্রীচৈতন্যকে চিনিতে পারিয়াছিল না, তাই উৎকলে তাঁহার অলৌকিক নৈষ্ঠিক জীবন যাপিত হইয়াছিল। মোহাচ্ছন্নতার জন্যই, রামমোহনকে, তদানীন্তন কালের লোকেরা চিনিতে বা বুঝিতে পারে নাই, তাই ব্রিষ্টলে তাঁহার মহাসমাধি হইয়াছিল। আর সেদিন, মোহাচ্ছন্নতার জন্যই, দরিদ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ্ বিবেকানন্দকে এদেশের লোকেরা তুচ্ছাতাচ্ছিল্য করিয়া, অসময়ে, বুঝিবা জীবনপাতের কারণ হইয়াছিল! আরো শুনিবে?—আরো বলিব? তিলক, কৃষ্ণকুমার বা অশ্বিনীকুমার—এই মোহাচ্ছন্নতার জন্যই, ভাবিতেছি, উন্মাদ বলিয়া তথা-কথিত বিজ্ঞসমাজে উপেক্ষিত! উপেক্ষিত বলি এই জন্য—তিলক, বিপিনচন্দ্র, অশ্বিনীকুমার ও কৃষ্ণকুমারের নির্ব্বাসনের জন্যই কনগ্রেস এবার এত আনন্দে ভরপুর হইতে পারিলেন এবং একটু দুঃখ প্রকাশ করা দূরে থাকুক, ঐ মেটা বসু-বানার্জির মাথায় পা এবং হাতে মোয়া দিয়া ভুলাইতে সমর্থ হইলেন এবং ইনি, উনি,তিনি কতরূপে "রিফরম মন্তব্যে"র কুহকে মাতিয়া,মলি ও লাট পাদ-বন্দনার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন! আমরা হাসিতেও চাই না, কাঁদিতেও চাই না,—যাহা আছি, তাহা লইয়াই "স্বভাবে"মজিয়া থাকিতে চাই। "স্ব" জিনিসটা যে এত মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে, কৃষ্ণকুমার বা অশ্বিনীকুমার আমাদের মধ্যে থাকিলে বুঝি এরূপ মহার্ঘ হইত না। মোহাচ্ছন্নতা—তাই আজও বিবাহে বিলাতী বাজনা বাজে, ভোজে বিদেশী চিনির মিঠাই ও বিলাতী খাদ্য অখাদ্য চলে;—আর বলিব কি, আনন্দের ফোয়ারা ছুটে! মোহাচ্ছন্নতার দিগ্বিজয়ী রাজত্ব!!

কিন্তু মোহাচ্ছন্নতা বিভীষিকার পূর্ব্বাভাস। মোহাচ্ছন্ন রাবণ, মদমত্ততায় দিগ্‌ভ্রান্ত, রিপুবাত্যা তাড়নায় কি না করিয়াছিল? দৈত্যকুলশ্রেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু ও কংস কি দর্পেই না মাতিয়াছিল! হায়—ভীতির দিগ্বিজয় প্রকম্পনে দেশ প্রকম্পিত;—চন্দ্র সূর্য্যও যেন সে কম্পনে দিশাহারা! চতুর্দ্দিকে জাগিতেছিল, কেবল ভয়, কেবল ভয়! দেবকীর অঞ্চলের ধনও যেন ভীতিসঞ্চালনে কাঁপিল;—জন্মাষ্টমীর কালরাত্রি যশোমতির ক্রোড়ে নব-আশা-উষাকে সমর্পণ করিল! কি মোহাচ্ছন্নতা গো!!

এরূপ মোহাচ্ছন্নতা কেবল এদেশের সঞ্চিত পাপ নয়—সকল দেশেরই গুপ্ত বিষ এই বিষকে হজম না করিলে, অ[illegible]

সিদ্ধ যোগীর অভ্যুদয় হয় না। এই রিপু-মোহাচ্ছন্নতাকে জয় করিয়া, এদেশে, যেমন লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত-বিনাশের ক্ষমতা পাইয়াছিলেন, ঐ ইতালীতেও, ম্যাট্‌সিনি অষ্ট্রীয়ার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার দুর্দ্ধর্ষ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। হায়, ম্যাট্‌সিনি কি বিষই না হজম করিয়াছিলেন। চির কৌমার্য্য ব্রত সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলেন, কিন্তু তবুও, ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মিথ্যা, প্রবঞ্চনা তাঁহাকে পরাস্ত করিতে বদ্ধপরিকর! তিনি অজেয় শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত, কিন্তু তবুও তাঁহাকে ফিরাইতে কত জনে, কত রূপে সচেষ্ট! হায়, নির্ব্বাসন, নির্য্যাতন তাঁহার ভাগ্যে কত ঘটিল, ইতিহাস তাহার সাক্ষী;—কিন্তু মোহাচ্ছন্ন ইতালী—তখনও জাগে নাই। হায়, সুইজারল্যাণ্ড, তোর আকাশে কি বিভীষিকা-বিনাশের বীজ রোপিত ছিল? মুক্ত গবাক্ষ-পথ দিয়া, ক্ষুদ্র পক্ষীর কলকণ্ঠের তানে সে বীজাঙ্কুর কি ম্যাট্‌সিনিকে অমর করিয়াছিল? তুই ধন্য, কেননা, তুই অজপা-জপে ম্যাটসিনিকে সিদ্ধি দিয়াছিলি। আর এদেশের কাব্যবিশারদ বা উপাধ্যায় নাকি স্বদেশের কালিমা স্মরণে জীবন ঢালিয়া গিয়াছেন;—এ আকাশে কি তাঁহাদের শক্তি সঞ্চারিত হইতেছে না? কে বলিবে, অশ্বিনীকুমার এবং কৃষ্ণকুমার, তিলক এবং বিপিনচন্দ্র কেন এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? ফিরিবার জন্য? মোহাচ্ছন্নতার জন্য? মরিবার জন্য? শুধু—লোক হাসাইবার জন্য?

না—তাহা অসম্ভব। চির সত্য—মোহাচ্ছন্নতার রাজ্যে বাস করে, বিভীষিকা, এবং বিভীষিকার পরপারে বাস করে,—মৃত্যুঞ্জয়-ধর্ম্ম-মন্ত্র। যখন ভয় বিভীষিকা নাই, তখন, সেই প্রথম যুগের লোক মরিতে ভয় পায়। কিন্তু শেষে, চতুর্দ্দিকে যখন কেবল ভয় আর ভয়, তখন লোক মড়িয়া হইয়া যায়—মরণের ভয় আর মানুষকে বিহ্বল করে না। যে মন্ত্রে ভয়কে জয় করা যায়, তখন মানুষ সেই মন্ত্রের আশ্রয় লয়। সে মন্ত্র—ধর্ম্মমন্ত্র। ইতিহাসে চিরদিন এই কথাই ঘোষিত হইয়াছে। মরিতে, মরিতে মরিতে—শেষে লোক মরণ-চিন্তাকে জয় করে,—অমর হইয়া যায়। "আছে, আছে, আছে" বলিতে বলিতে "নাই"ও যেমন সত্ত্বাবান হয়, তেমনি, মৃত্যু-মন্ত্র সাধনে সাধনে মানুষ "অমরত্ব" লাভ করে। "অমরত্ব" লাভের অর্থ কি?—অর্থ আর কিছুই নয়-কেবল ইহাই যে, এ সংসারের লাভালাভ-গণনা ভোজের বাজি, আসক্তি বিরক্তি আকাশ-কুসুম, সার কেবল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম চিন্তায় মজিলে মৃত্যু আর ভয়ের জিনিস থাকে না, মৃত্যুর ভিতর দিয়া সচ্চিদানন্দে মানুষ নিমগ্ন হয়। মরে কে, যে পাপে নিমগ্ন। বাঁচে কে? যে পুণ্যে উৎফুল্ল। পাপাসুরকে মানুষ যখন জয় করিয়াছে,—আপন রিপুকুল যখন পরাস্ত বা নির্ব্বাণ হইয়াছে, বিভীষণ যখন ধর্ম্ম-রামে যুক্ত হইয়াছে, তখন সেখানে অধর্ম্মের বিনাশে ধর্ম্ম-সতীর উদ্ধার হইয়াছে। অথবা নিরঞ্জনা-তটে মার পিশুনের অত্যাচার হইতে জাগিয়া উঠিয়াছেন—মহানির্ব্বাণের মহাদেবতা—শাক্যসিংহ। অথবা, আসক্তি যখন বিনষ্ট, সতী যখন চক্রে খণ্ড খণ্ড হইয়াছেন, তখন ত্রিপুরারি মাভৈঃ মাভৈঃ রবে জগৎ কাঁপাইয়া বিচরণ করিতেছেন।

সে ভীত, তুমি ভীত, আমিও ভীত। ভীতির রাজ্যে ভীত নয় কে? তাঁহারা বাড়ী তল্লাস করে, কত পীড়ন করে, কত সম্মান হানি করে, কত কি নষ্ট করে, বাড়ীকে শ্মশান

করে, শুনিতেছি কত কি করে! ধ্রুব প্রহ্লাদ কি অত্যাচারে সুরক্ষিত ছিলেন? কিন্তু চিন্তা কর, খ্রীষ্ট কি লৌহশলাকায় বিদ্ধ হন নাই? ভাব, ম্যাট্‌সিনি কি নির্ব্বাসিত হন নাই? কিন্তু তাঁহারা কখনও শত্রুর সহিত শত্রুতা সাধন করেন নাই। এ সংসারে কে ভীতির রাজ্যে নির্ভয়, বলত? ভয়কে যে ভয় করে না, আমরা বলি, কেবল সেই সুরক্ষিত। ভয়কে ভয় না করিয়া পারে কে? যে জন রিপু-জয়ে সমর্থ, আর কেহই নয়। রিপু-জয়ে সমর্থ কে? যে ঈশ্বরের অনুগত। সব ভীতি নিরসনের মূলমন্ত্র কেবল—ধর্ম্ম। রিপু জয়ে ম্যাট্‌সিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কোন ভয়েই বিচলিত হইতেন না। মোহম্মদ খ্রীষ্ট, ধ্রুব বা প্রহ্লাদও, ধর্ম্মের অনুসরণে, কোন ভয়কেই ভয় মনে করিতেন না। মনে করিতেন—সকল অবস্থা এবং ঘটনাতেই কেবল রক্ষাকর্ত্তা বিশ্বেশ্বর বিদ্যমান। জীবনে মরণে—সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্ব ঘটে যে ঈশ্বরকে দেখে, কোন্ ভয় তাঁহাকে ভীত করিতে পারে? আমরা যদি "ঈশ্বর" মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, এ সংসার জয়ের অমোঘ বীজাঙ্কুর প্রাপ্তি আমাদের ঘটিবে; এবং যেমন মহাজনেরা হাসিতে হাসিতে দেহত্যাগ করিয়া অমর হইয়াছেন, আমরাও, সেইরূপ, দেহত্যাগের ভিতর দিয়া নিত্যানন্দে বিভোর হইয়া অমর হইব। কি ভয়, কিসের ভয়? শরীরকে লোকেরা বাঁধিতে পারে, মনকে বাঁধিতে পারে কে? শারীর চিন্তা সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করিলে, তবে আমরা সংসারের লাভালাভ-গণনার অতীত নিত্যানন্দধামে পৌঁছিতে পারিব।

তাঁহারা বলিতেছেন, এদেশে "স্ব" বিনাশের আর অধিক বিলম্ব নাই। আমরাও বলিতেছি, "স্ব" জাগরণের আর অধিক অপেক্ষা নাই। "স্ব"—অর্থ আর কিছুই নয়—"স্ব" অর্থে মানুষের মহাধর্ম্ম,—যাহা ভিন্ন মানুষের একদিনও চলে না;—স্ব-ভাব, স্বজন, স্ব-পরিবার, স্বদেশ, স্বজাতি। এই সকলের সেবা মিলিয়া স্বধর্ম্ম। সুতরাং "স্ব" সেবাই—দেহধারী মানবের চরম লক্ষ্য। "স্ব" মূলে প্রথম বিধাতাকে দেখিতে হইবে; তারপর তাঁহার "বিশ্বরূপে" দীক্ষা হইবে। যাহারা কোন সাধনার ধার ধারে না, তাহারাই "স্ব" ছাড়িয়া, ব্যক্ত ছাড়িয়া বিশ্বে ধাবিত হয়। "স্ব"-সাধন ভিন্ন জাতীয় একতা বা আর যাহা বল, সকলই অসম্ভব। বিভীষিকা যখন জাগিয়াছে—তখন স্ব সাধন-ক্ষেত্রে মরণের ভয় নিশ্চয় যাইবে,—স্ব-ধর্ম্মের জয় নিশ্চয় হইবে, পুণ্যের রাজত্ব নিশ্চয় আবার সংস্থাপিত হইবে। সুসময়, কুসময়,—সব সময়ে মানুষের কেবল এক লক্ষ্য হওয়া উচিত—কেবল স্বধর্ম্ম রক্ষা। এ দেশের নরনারী দারিদ্র্য-পীড়নে নিষ্পেষিত, তাহাদিগকে রক্ষা করা যদি তোমার ধর্ম্ম হয়, "স্বদেশীয়" ব্রত পালনে, নির্য্যাতনকে ভয় করিও না। আর "স্বদেশী"কে যদি ধর্ম্মের অঙ্গ মনে না কর, সরিয়া দাঁড়াও; ভয়ে ভয়ে ফিরিও না, আসিও না, দাঁড়াইও না;—"শ্যাম রাখি কি কুল রাখি"—এ চিন্তায় বিভোর হইও না। সঙ্কোচ, প্রকম্পন, ভীতি, জগতের এসব মোহময় স্বপ্ন ভুলিয়া যাও। ঐ মেটা তোমাকে স্বর্গে তুলিবে না, ঐ বিদেশী বণিকেরাও তোমাকে রক্ষা করিবে না। যে দেশ তোমাকে জল বায়ু শস্য দ্বারা রক্ষা করিতেছে, সেই দেশকে রক্ষা করাকে "স্বধর্ম্ম" বলিয়া জানিয়া রাখ। এই ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হও, বদ্ধপরিকর হও, আর কিছুই প্রার্থনা নাই। যদি তাহা পার, এই ধর্ম্মই তোমাকে স্বর্গে রাজা করিবে। অতএব, এই দুর্দ্দিনে, আর কিছুই কর্ত্তব্য নাই—কর্ত্তব্য কেবল—"স্ব" বলিতে যাহা, তাহার সংরক্ষণ। "স্ব"কে, ভাই, কিছুতেই ডুবাইও না, কিছুতেই মরিতে দিও না। যদি "স্ব" যায়—এদেশ মহা দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইবে,—চিরকালের জন্য ডুবিবে। আবার বলি, ভাই, "স্ব" তোমার মন্ত্র হউক, "স্ব" তোমার জপ হউক, "স্ব" তোমার তপ হউক, "স্ব" তোমার লক্ষ্য হউক। এই স্বধর্ম্মের পথ ধরিয়া, এস ভাই, আমরা স্বর্গের যাত্রী হই।